ইউনিট ৮

মাঠ ফসল উৎপাদন

ভূমিকা

ধান, পাট, আখ, পেঁপে, আনারস, কলার উৎপাদন প্রক্রিয়া এক রকম নয়। বলুনতো পার্থক্য কোথায়? ধান, পাট, আখ চাষে প্রতিটি গাছের আলাদাভাবে যত্ন নেবার প্রয়োজন হয় না। সার্বিকভাবে মাঠের ফসলের যত্ন নেওয়া হয়। কিন্তু কলা বা পেঁপে বা আনারসের প্রতিটি গাছের যত্ন না নিলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না। সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও যত্নে যে ফসল উৎপাদিত হয় তা হলো মাঠ ফসল। আর যে ফসলের প্রতি গাছের যত্নের প্রয়োজন তা হলো উদ্যানতাত্বিক ফসল। এ ইউনিটে আমরা মাঠ ফসল সম্পর্কে আলোচনা করব।

পাঠ- ১: বীজ, ভাল বীজের বৈশিষ্ট্য, বীজ সংরক্ষণ, বীজের বিশুদ্ধতা এবং বীজতলা

পাঠ- ২: ভূমিকর্ষণ, প্রয়োজনীয়তা, পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি

পাঠ- ৩: সার ও সারের শ্রেণিবিভাগ, ফসল উৎপাদনে সারের প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগ পদ্ধতি

পাঠ- ৪: শস্য সংরক্ষণ ও শস্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, কীট পতঙ্গ ও রোগ বালাই দমন পদ্ধতি

পাঠ- ৫: ব্যবহারিক: বীজের অঙ্কুরোদগম ও জৈবসার প্রস্তুতকরণ

পাঠ ১

বীজ, ভাল বীজের বৈশিষ্ট্য, বীজ সংরক্ষণ, বীজের বিশুদ্ধতা এবং বীজতলা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বীজ কাকে বলে বুঝিয়ে বলতে পারবেন;
- ভাল বীজের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- বীজ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া আলোচনা করতে পারবেন;
- বীজের বিশুদ্ধতা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- বীজতলা তৈরি প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

বীজ কি

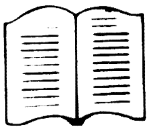

পাটের দানা, কাঁঠালের বীচি, আমের আটি মাটিতে বুনলে বা পুতলে এবং প্রয়োজনীয় পরিবেশ প্রদান করলে চারা গাছ এবং চারা গাছ আস্তে আস্তে বড় গাছে পরিণত হয়। আবার কচুর লতা, আখের ডগা, মান্দারের ডাল, গোলআলু, কলার শোষক মাটিতে লাগালে নতুন গাছে পরিণত হয়। এবার একটু ভাবুনতো বীজ কি? গাছের যে অংশ মাটিতে রোপণ বা বপন করে উপযুক্ত পরিবেশ প্রদানের মাধ্যমে নতুন গাছের জন্ম হয় এবং মাতৃগাছের মত শাখা প্রশাখা, ফুল, ফল ও বীজ প্রদান করতে সক্ষম হয় তাদেরকেই বীজ বলা হয়।

গাছের যে অংশ মাতৃগাছের মত নতুন গাছ জন্মাতে পারে তাকেই বীজ বলা হয়।

বীজের গুরুত্ব

ফসল উৎপাদনে বীজ মুখ্য ও মৌলিক উপাদান। মানুষ এবং পশু পাখির খাদ্য হিসেবে বীজ ব্যবহৃত হয়। বীজের ব্যবসা করে বহু মানুষ জীবিকা ধারণ করে। বীজ থেকে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ তৈরি হয়। বীজ থেকে নানা জাতের রং তৈরি করা হয়। শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে বীজ ব্যবহৃত হয়। বীজ রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। একমাত্র উন্নত জাতের বিশুদ্ধ বীজের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব। বিগত দুদশকে আমাদের ধান এবং আলুর ফলন দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা কেমনে সম্ভব হলো? এ সম্ভাবনার পিছনে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে উন্নত মানের বীজ।

ফসল উৎপাদনে বীজ মৌলিক উপাদান। বীজ খাদ্য, ঔষধ তৈরির উপকরণ এবং শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শস্য উৎপাদনে বীজের গুরুত্ব অপরিসীম।

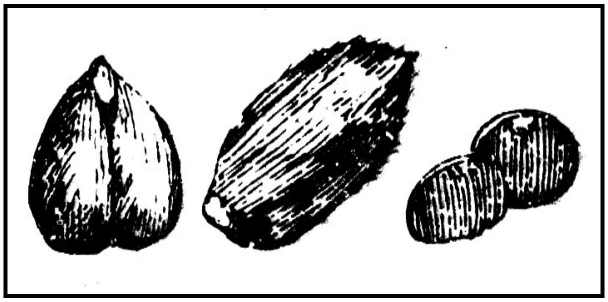

চিত্র ৮.১.১: বিভিন্ন ধরনের বীজ।

ভাল বীজের বৈশিষ্ট্য

স্বাস্থ্যবতী ভাল মা সুস্থ সন্তান প্রসব করে এ কথা সকলেরই জানা। তা হলে বলুন সুস্থ গাছ এবং আশানুরূপ ফলন পেতে হলে কেমন বীজের দরকার? আশা করা যায় সকলেই বলবেন উত্তম বীজের। তা হলে চলুন আমরা উত্তম বীজের বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নেই।

- ভাল বীজ সব সময় বংশীয়ভাবে বিশুদ্ধ হবে।
- অন্য জাতের বীজ মিশ্রিত থাকবে না।
- বীজ রোগাক্রান্ত ও পোকার খাওয়া হবে না।
- বীজ দেখতে আকর্ষণীয় ও উজ্জ্বল হবে।
- বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ হবে।
- উৎপাদিত শস্য মাতৃগুণ বিশিষ্ট হবে।

উত্তম বীজ উৎকৃষ্ট ফসল উৎপাদনে সক্ষম।

বীজ সংরক্ষণ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক মৌসুমের বীজ দিয়েই পরবর্তী মৌসুমের ফসল উৎপাদন করা হয়। তাই আদর্শ পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষিত না হলে বীজের সজীবতা ও সতেজতা নষ্ট হয়ে যায়। আর সে বীজ থেকে সজীব ও সতেজ গাছ জন্মায় না, ফলে কা ক্ষিত ফলন পাওয়া যায় না। তাই বীজ থেকে ভাল উৎপাদন পেতে হলে উত্তম পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে কারোর দ্বিমত থাকার কথা নয়। এখন দেখা যাক কিভাবে বীজ সংরক্ষণ করা যায় এবং সংরক্ষণ করার আগের কাজগুলো কি?

বীজ সংগ্রহপূর্ব কাজ

- উন্নতমানের ভাল বীজ পেতে হলে মাতৃগাছকে পোকা ও রোগমুক্ত রাখতে হবে।
- মাতৃ গাছের বীজ পুষ্ট হলে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- জমিতে কোন আগাছা থাকলে গাছে ফুল আসার পূর্বেই তা ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
- মাঠেই গ্রহণযোগ্য গাছ বাছাই করে পরে নির্বাচিত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

বীজ সংরক্ষণ

বীজের প্রয়োজনীয় গুণগুলো ঠিক রাখার জন্য নিচে উল্লিখিত নীতিগুলো মেনে চলা প্রয়োজন:

- যে জাতের বীজ দীর্ঘদিন সজীব থাকে সংরক্ষণের জন্য সেরূপ বীজ নির্বচন করতে হবে।
- শুষ্ক ও ঠাণ্ডা পরিবেশে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে।
- বীজ সংরক্ষণাগার অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং শুষ্ক হবে।
- বীজ সংরক্ষণের পূর্বে সংরক্ষণ পাত্র পোকা মাকড় ও রোগমুক্ত করে নিতে হবে।
- সংরক্ষিত বীজ সঠিক অবস্থায় আছে কি না তা মধ্যে মধ্যে যাচাই করতে হবে।
- সংরক্ষণের জন্য নির্বাচিত স্থানে রোগ ও পোকা প্রতিরোধক ব্যবস্থা করতে হবে এবং বীজ স্বাস্থ্য সম্মত অবস্থায় রাখতে হবে।

বীজ সংরক্ষণ নীতি মেন চললে ফলন বাড়বে।

বীজের বিশুদ্ধতা

আশানুরূপ ফলনের জন্য বিশুদ্ধ বীজের কোন বিকল্প নেই। চাষাবাদের সকল নিয়ামক ঠিক থাকলে ও শুধু বিশুদ্ধ বীজের অভাবে শস্যের শতকরা ২৫ ভাগ বা তারও বেশি কমে যেতে পারে। পাজাম ধানের বীজের সাথে মালা ধানের বীজ মিশে গেলে আর তা বপন করলে তার ফলন কি আশাপ্রদ হতে পারে? কখনও না, কারণ মালা ধান যখন পেকে আসবে পাজামে তখন মাত্র ফুল আসবে। তাই এক খন্ড জমিতে এককালীন চাষের জন্য এ ধরনের মিশ্রণ বর্জিত বীজ বপন অত্যাবশ্যক। এ ধরনের বিশদ্ধতাকে **অমিশ্রণজনিত বিশুদ্ধতা** বলে। পাশাপাশি জমিতে বিভিন্ন জাতের ফলস জন্মালে বাতাস বা পোকা মাকড় দ্বারা বিভিন্ন ধরনের পরাগায়ন ঘটে। এর ফলে যেমন মালা ধানের সাথে চান্দিনার সংমিশ্রণে নতুন জাতের ধানের সৃষ্টি হবে এবং জাত বৈশিষ্ট্য ঠিক রাখতে না পারলে ফলন কমে যাবে।

$$\frac{খ}{ক} \times ১০০$$

যে কোন ফসলের কাঙ্খিত ফলনের জন্য বীজ অমিশ্রণজনিত এবং বংশগতভাবে বিশুদ্ধ হতে হবে।

বীজের বিশুদ্ধতা নির্ধারণ

আশানরূপ ফলনের জন্য বীজের বিশুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনাদের আর দ্বিমত নাই। তাই কোন ফসলের বীজের উপজাতের বীজ, ঘাস বীজ, মাটি কংকর ইত্যাদি মিশ্রিত থাকবে না। তাই বীজ বপনের আগে বীজের বিশুদ্ধতার হার জেনে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। নির্দিষ্ট ফসলের বীজের নমুনা নিয়ে তার ওজন নিতে হবে। তারপর যাবতীয় মিশ্রণ ফেলে দিয়ে ওজন নিতে হবে। ধরি প্রথমবার “ক” গ্রাম বীজ ছিল এবং দ্বিতীয়বার “খ” গ্রাম পাওয়া গেল। এক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার হার হবে।

বীজ বপনের অগে বীজের বিশুদ্ধতার হার জেনে নিলে বীজের অপচয় কম হয় এবং শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

বীজতলা

সকল মাঠ ফসলের জন্য বীজ তলার চারা উৎপাদন প্রয়োজন হয় না। আবার কোন কোন ফসলের জন্য বীতলায় চারা উত্তোলন আত্যাবশ্যক। এ ধরনের একটি ফসলের নাম করুন তো? নিশ্চয় সকলেই এক বাক্যে বলবেন “ধান”। মাঠ ফসলের মধ্যে ধান চাষের জন্য পৃথিবীর সকল দেশেই বীজতলা তৈরি করা হয়। বীজতলা প্রসঙ্গে আমরা ধানের বীজতলা সম্পর্কেই আমাদের আলোচনা সীমিত রাখবো। বলুন তো ধানের বীজতলা কত প্রকারের হতে পারে। ধানের বীজতলা ৪ প্রকারে করা যায়।

- শুকনা বীজতলা
- ভিজা বীজতলা
- ভাসমান বীজতলা
- দাপগ বীজতলা।

কোন কোন ফসলের জন্য বীজতলা অত্যাবশ্যক। যেমন- ধান। ধানের বীজতলা চার রকমের হয়- শুকনা, ভিজা, ভাসমান ও দাপগ।

শুকনা বীজতলা

বাংলাদেশের সর্বত্র শুকনা বীজতলার প্রচলন আছে। তবে সর্বত্র বিজ্ঞান ভিত্তিক বীজতলা করা হয় না। এত বীজের আপচয় হয় এবং চারা দুর্বল হয়। যার ফলে শস্যের উৎপাদন কম হয়। বিজ্ঞান সম্মত বীজতলা তৈরির জন্য উপযুক্ত আর্দ্রতায় মাটি ৪/৫ বার ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হয়। তারপর যাবতীয় আগাছা পরিষ্কার করে ফেলতে হয়। এবার প্রয়োজন মত বীজতলাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবে ভাগ করে নিতে হবে। প্রতিটি ক্ষুদ্র বীজতলা ১–১$\frac{১}{৪}$ মিটার প্রশস্ত হবে এবং প্রয়োজন মত লম্বা হবে। প্রতি ২টি খন্ডের মধ্যে ২৫–৩০ সে.মি. ফাঁকা জায়গা রেখে দিতে হবে। এ জায়গার মাটি ২ দিকের বীজ তলায় উঠিয়ে দিলে বীজ তলা কিছুটা উঁচু হবে। ফলে পানি জমে থাকবে না। আবার এ ফাঁকা জায়গায় বসে ২ দিকের আগাছা পরিষ্কার করা ও নিড়ানী দেওয়া সম্ভব হবে।

জমি প্রস্তুতির পর প্রয়োজন মত বীজ বপন করে মাটি হাল্কাভাবে কুপিয়ে বীজ বুনতে হবে এবং বীজ সমেত মাটি ভালভাবে নাড়াচড়া করতে হবে যাতে বীজগুলো অন্তত মাটির ৩/৪ সেন্টিমিটার নিচে পড়ে। চারা গজাবার পর আগাছা পরিষ্কার ও ঘন চারা পাতলা করে প্রয়োজনমত সেচ দিতে হবে। পোকা মাকড়ের ঔষধ প্রয়োগ অপরিহার্য।

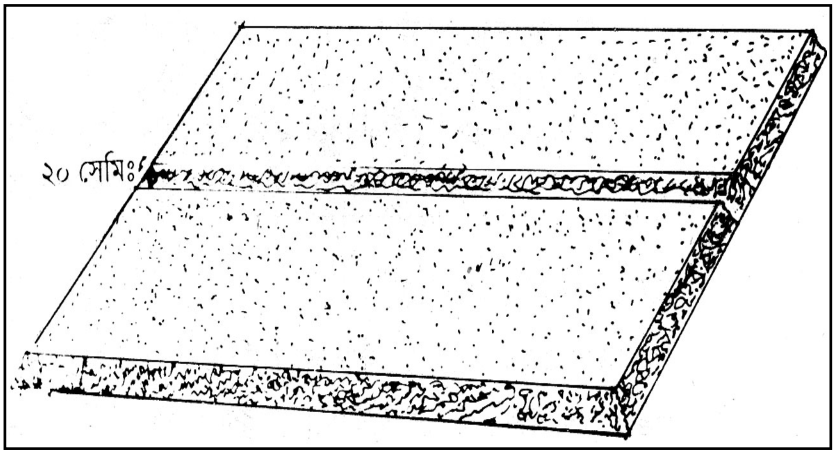

চিত্র ৮.১.২: শুকনা বীজতলা।

শুকনা বীজতলার জন্য মাটি চাষ মই দিয়ে ঝুর ঝুরে করে নিতে হবে। চার যত্নের সুবিধার্থে বীজতলাকে ১–১$\frac{১}{৪}$ মিটার প্রশস্ত এবং প্রয়োজন মত লম্বা করে ভাগ করতে হবে। দুটি বীজতলার মধ্যে ২৫–৩০ সে.মি. ফাঁকা রাখতে হবে। বীজ বুনে মাটির সাথে নাড়াচাড় করে অন্তত ৩–৪ সে. মাটির নিচে ফেলতে হবে।

ভিজা বীজতলা

মৌসুমী বায়ু প্রভাবিত বাংলাদেশে ভিজা বীজতলার প্রচলন বেশি। এ বীজতলার জন্য দো-আঁশ ও এটেল দো-আঁশ মাটি উত্তম। জমি নির্বাচন করে কমপক্ষে ২টি চাষ ও ২টি মই আড়াআড়িভাবে দিয়ে অন্তত ৮/১০ দিন ফেলে রাখতে হবে যার ফলে আগাছা এবং অন্যান্য আবর্জনা পচে যাবে। এ সময় জমিতে অবশ্যই পানি থাকতে হবে। তারপর আরো ৪/৫টি চাষ মই দিয়ে জমি থকথকে কাদাময় করতে হবে। জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে জমিতে প্রয়োজনমত গোবর বা আবর্জনা পচা সার প্রয়োগ করতে হবে। এবার প্রতিটি বীজতলা ১ মিটার চওড়া করে পুরো জমিটিকে অনেকগুলো বীজতলায় ভাগ করে নিতে হবে। দুটো বীজতলার মাঝখানে ৫০ সে.মি. জায়গা রেখে দিতে হবে। এ জায়গার মাটি দুদিকে বীজতলায় উঠিয়ে বীজতলা উচু করে নিতে হবে। ফলে মধ্যখানে নালার সৃষ্টি হবে। এ নালা দিয়ে পানি নিকাশ ও সেচের কাজ চলবে। এছাড়া এ জায়গায় বসে দুদিকের বীজতলার অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা করা সম্ভব হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে কাদা যেন পাতলা না হয়ে যায়। বীজতলার মাটি খুব সুন্দরভাবে সমান করতে হবে। এ পদ্ধতিতে বোনার আগেই বীজ গজিয়ে নেওয়া হয়। বীজতলা তৈরি হবার পর অন্তত কয়েক ঘন্টা শুকিয়ে বীজ বোনা উত্তম।

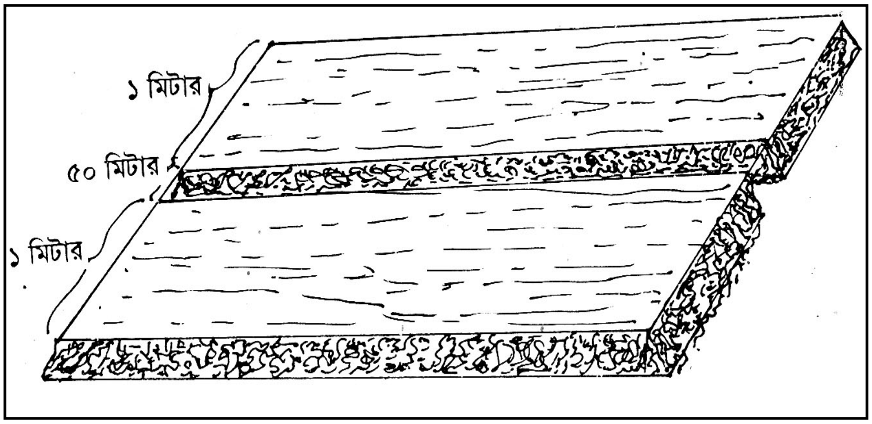

চিত্র ৮.১.৩: ভিজা বীজতলা।

ভিজা বীজতলার জন্য দো-আঁশ ও এটেল দো-আঁশ মাটি উত্তম। জমি প্রয়োজনীয় চাষ ও মই দিয়ে উত্তমরূপে কাদা করে নিতে হবে। প্রতিটি বীজতলা ১ মিটার প্রশস্ত এবং প্রয়োজনমত দীর্ঘ হবে। প্রতি ২টি বীজতলার মাঝে ৫০ সে.মি. ফাঁকা রেখে ঐ জায়গার মাটি ২ দিকে উঠিয়ে দিয়ে একটা নালার মত করে নিতে হবে। তার সাহায্যে পানি সেচ সম্ভব হবে। বীজ বোনার আগে বীজ গজিয়ে নিতে হবে।

ভাসমান বীজতলা

বাংলাদেশে প্রায়ই বন্যা হয়। বীজতলা তৈরি করার মত জায়গাও অনেক সময় পাওয়া যায় না। কিন্তু বন্যার পরেই আবার জমিতে চারা বুনতে হয়। তাই ভাসমান পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরি করে চারা উৎপাদন করলে চাষের সুবিধা হয়। বাঁশের মাচা অথবা কলা গাছের ভেলার উপর কলার পাতা বা পলিথিন বিছিয়ে তার উপর ৩/৪ ইঞ্চি কাদার প্রলেপ দিয়ে পারিপাটি করে বীজ বুনতে হয়। ভেলা বা মাচা ভাল খুটি বা গাছের সাথে শক্ত করে বেধে রাখতে হয় যেন বন্যার পানি ভাসিয়ে নিয়ে না যায়।

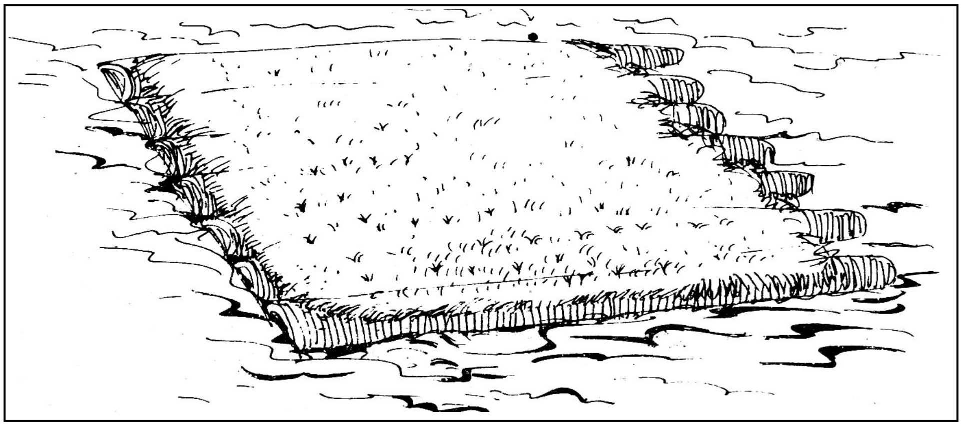

চিত্র ৮.১.৪: ভাসমান বীজতলা।

বন্যার পর পরই যাতে জমিতে লাগাবার উপযোগী ধানের চারা পাওয়া যায় তার জন্য বাঁশের মাচা বা কলাগাছের ভেলার উপর কলাপাতা বা পলিথিন বিছিয়ে তার উপর ৩/৪ ইঞ্চি কাদা দিয়ে বীজ বুনতে হয়। এটাই ভাসমান বীজতলা।

দাপগ বীজতলা

ভাসমান বীজতলার মত দাপগ বীজতলা বন্যা কবলিত এলাকার জন্যই করা হয়। এ বীজতলা সাধারণত বন্যা কবলিত এলাকার উচু জায়গা বা বাড়ির উঠানে ইট বা কলাগাছের খোল দিয়ে চৌকোণাকার ঘরের মত করে তাতে পলিথিন বিছিয়ে তার উপর অঙ্কুরিত বীজ বুনতে হয়। বীজ বপনের পর ৩/৪ দিন পর্যন্ত শক্ত কাঠি দিয়ে নাড়াচাড়া করে দিতে হবে যেন শিকড়গুলো লেগে না যায়। এ চারা বপনের ১৪/১৫ দিনের মধ্যে অল্প পানি বিশিষ্ট পলিময় জমিতে রোপণ করে দিতে হয়। এ পদ্ধতিতে অল্প পরিমাণ জায়গায় অনেক চারা উৎপাদন সম্ভব। আবার যেহেতু মাটির ছোঁয়াচ নাই তাই ১৪/১৫ দিনের মধ্যে চারা না লাগালে খাদ্যের অভাবে মারা যায়।

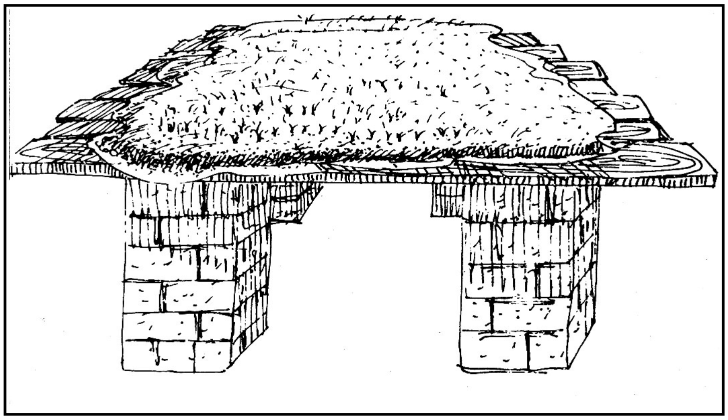

চিত্র ৮.১.৫: দাপগ বীজতলা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে এক (ক) বৃত্তায়িত করুন)।

১. মাঠ ফসল বলতে কি বুঝায়?
ক. মাঠে বুনা ফসল
খ. সার্বিক পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপন্ন ফসল
গ. বিশেষ পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপন্ন ফসল
ঘ. প্রতিটি গাছের জন্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করা।

২. নিম্নের কোনটি মাঠ ফসল?
ক. রোপা আমন
খ. কলা
গ. টমেটো
ঘ. পটল।

৩. নিচের কোনটি বীজ?
ক. লাউ এর ডগা
খ. আখের ডগা
গ. কাঁঠালের শিকড়
ঘ. পান পাতা।

৪. পাজামের সাথে নাইজার শাইলের প্রাকৃতিক মিশ্রণে পাজামের ফলন কমে যাবে কেন?
ক. পাজাম জাতের ধান গাছ বেশি লম্বা এবং অল্প বাতাসে হেলে যায়
খ. পাজাম এবং নাইজার শাইল একই সময়ে পাকবেনা
গ. পাজামে রোগ আক্রমণ বেশি হবে
ঘ. পাজামে কুশির সংখ্যা কমে যাবে।

৫. কৃষি উন্নয়নে বীজের গুরুত্ব সর্বাধিক কেন?
ক. বীজ রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়
খ. উন্নত জাতের বীজ শস্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারে
গ. উন্নত জাতের বীজ রোগ প্রতিরোধ সক্ষম
ঘ. উন্নতজাতের বীজ কৃষকদিগকে সহজে আকৃষ্ট করে।

আ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর

১. মাঠ ফসল কি সংক্ষেপে লিখুন।
২. বীজ বলতে কি বুঝেন?
৩. বীজের বিশুদ্ধতা কি?
৪. বীজ সংরক্ষণের উপায়গুলো উল্লেখ করুন।
৫. বীজতলা তৈরির ভিজা পদ্ধতির বর্ণনা দিন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ক, ৩। খ, ৪। খ, ৫। খ।

পাঠ ২ ভূমিকর্ষণ, প্রয়োজনীয়তা, পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ভূমিকর্ষণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- ভূমিকর্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ভূমিকর্ষণ পদ্ধতিগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন;
- ভূমিকর্ষণ যন্ত্রপাতির নাম বলতে পারবেন এবং
- ভূমিকর্ষণ যন্ত্রপাতির কাজসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

ভূমিকর্ষণ

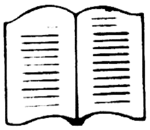

একথা অনেকেই জানেন যে, লাঙ্গল আকিস্কারের পূর্বেও মানুষ উদ্ভিদ জন্মাতো এবং উদ্ভিদের ফলন বৃদ্ধির জন্য গাছের বাঁকা ডাল অথবা বিভিন্ন আকারের পাথর দ্বারা ভূমি আলোড়িত করতো। বিভিন্ন ভাবে ভূমি আলোড়নের ফলে ভূমির ভৌতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তিত অবস্থাকে কর্ষিতাবস্থা বলে।

প্রাচীনকালে দেশী লাঙ্গল তারপর আস্তে আস্তে উন্নত পদ্ধতির লাঙ্গল আবিষ্কৃত হওয়ায় মানুষ যথার্থভাবে ভূমি কর্ষণের সুযোগ পায়। ভূমি কর্ষণের মধ্যমে মাটি আলগা ও গুড়া করে ফসলের বীজ বা চারাগাছ বুনলে গাছর অঙ্কুরোদগম সহজ হয়। চারগাছ গুড়া মাটি থেকে সহজে খাদ্য গ্রহণ করে মোটা তাজা হয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে পরিণত বয়সে সুন্দর ফলন প্রদান করে। তা হলে বলুন ভূমি কর্ষণ কাকে বলে? **গাছের সুষম বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্ষণ যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ভূমির ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন প্রক্রিয়াকে ভূমি কর্ষণ বলে**। একথা সহজেই অনুমেয় বিভিন্ন ফসলের জন্য কর্ষণ গভীরতা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। বলুন তো পাট ও গমের জন্য ভূমিকর্ষণ গভীরতা কি এক হবে?

প্রাচীনকাল থেকেই ভূমিকর্ষণের প্রচলন ছিল। কর্ষণ যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ভূমির ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন সাধনই ভূমিকর্ষণ। বিভিন্ন ফসলের জন্য ভূমিকর্ষণ বিভিন্ন হয়ে থাকে।

ভূমিকর্ষণের প্রয়োজনীয়তা

এতক্ষণ আপনারা ভূমিকর্ষণ কি এবং কেন একথা জানতে পেরেছেন। এবার একটু ভাল করে চিন্তা করে দেখুন এর প্রয়োজনীয়তা কি? ভূমি কর্ষণের প্রধান প্রধান প্রয়োজনীয়তাগুলো নিচে আলাচনা করা হলো–

পতিত জমিকে কর্ষণের মাধ্যমে উন্মুক্ত করে তার আভ্যন্তরীণ অবস্থার ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। শস্য উৎপাদনে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এর ফলে সূর্যের আলো কর্ষিত জমিতে প্রবেশ করে ও পেকা মাকড় ও রোগ জীবাণু ধ্বংস করে। কর্ষিত ভূমিতে সহজে বায়ু প্রবেশ করে। ভূমির আগাছা মরে যায় এবং আস্তে আস্তে পচে গিয়ে ভূমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। এ সকল কারণে বীজের অঙ্কুর সহজে গজায়, চারা-গাছ সহজে খাদ্য পায়, গাছের বৃদ্ধি ত্বরিত হয়। বার বার কর্ষণের ফলে জৈব ও অজৈব পদার্থ সুষমভাবে মিশে গিয়ে শস্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রথম চাষে জমিতেই বড় বড় ঢিলা উঠে। বার বার চাষ মই এর সাহায্যে ঢিলা গুড়া হয়ে গিয়ে শস্য উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। চাষ, মই ও আচড়া বা ট্রাক্টরের সাহায্যে অসমান জমিকে সহজেই সমতল জমিতে পরিণত করা যায়। বিভিন্ন জৈব ও অজৈব সার যেমন- ইউরিয়া, ফসফেট, পটাশ, গোবর, খৈল এবং কম্পোস্ট সার জমিতে উত্তমরূপে মেশানোর জন্য জমি উত্তরূপে কর্ষণ করা উচিত। শস্য কর্তনের পর জমিতে অড়াআড়ি চাষ মই দিলে শস্যের অতিরিক্ত অংশ পঁচে গিয়ে জৈব সারে পরিণত হয়।

ভূমি কর্ষণ মাটির ভিতরের ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। মাটি পর্যাপ্ত বাতাস ও স র্যালোক পায়। পোকা মাকড় ও রোগ জীবাণু ধ্বংস হয়। জমিতে বিভিন্ন সার উত্তমরূপে মেশানোর জন্য ভূমি কর্ষণ প্রয়োজন। ভূমি কর্ষণ মাটিকে রসাল করে।

কর্ষণ পদ্ধতি

বিভিন্ন ধরনের কর্ষণ পদ্ধতি পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরাতন কর্ষণ পদ্ধতি প্রচলিত। তবে আস্তে আস্তে এ দেশগুলোতে আধুনিক কর্ষণ পদ্ধতির প্রচলন বাড়ছে। প্রচলিত কর্ষণ পদ্ধতিসমূহ হলো–

লাঙ্গলের সাহায্যে চাষ

বাংলাদেশে প্রাথমিক কর্ষণ দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে হয়ে থাকে। তবে কিছু সংখ্যক বিত্তবান চাষী বা সমবায়ীরা চাষের জন্য কলের লাঙ্গল বা ট্রাক্টর ব্যবহার করে থাকেন। মই এর সাহায্যে ঢিলা ভাঙ্গা এবং ভূমি সমতল করা হয়।

আড়াআড়ি চাষের পরে বাঁশ বা কাঠ নির্মিত মই এর সাহায্যে ভূমির ঢিলা ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং ভূমিকে সমতল করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে হ্যারো বা যান্ত্রিক মই ও ব্যবহার করা হয়।

আপনাদের এগুলো অতি পরিচিত অনুশীলন। মুষ্টিমেয় ২/৪ জন বাদ দিলে আপনারা সকলেই এই পদ্ধতিগুলোর সাথে পরিচিত।

আমাদের দেশের কর্ষণ পদ্ধতি অতি প্রাচীন। তবে আধুনিক কর্ষণ পদ্ধতি আস্তে আস্তে প্রচলিত হচ্ছে। লাঙ্গল কর্ষণ ও মই ঢিলা ভাঙ্গন ও মাটি সমতল করার জন্য ব্যবহার করা যায়।

আন্ত কর্ষণ

মাঠে শস্য থাকা অবস্থায় আন্তকর্ষণের কাজ করা হয়ে থাকে। এরূপ দু'য়েকটি কাজের নাম বলুনতো? এ কাজটি আপনাদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টির পর মাটি শুকিয়ে আসলে পাট ক্ষেত্রে বা আউশ ধান ক্ষেত্রে আচড়া দিতে দেখেছেন? আন্তকর্ষণ কোদাল বা কাস্তের সাহায্যেও করা হয়ে থাকে। যেমন আখ বা পাটের জমি যেখানে সারি করে বীজ বোনা হয় সেখানে কোদালের সাহায্যে, আবার পাটের জমি যেখানে সারি ব্যবহার করা হয় না সেখানে নিড়ানির সাহায্যে আন্তকর্ষণ করা হয়। আন্তকর্ষণ মাটিকে রস ধরে রাখতে সাহায্য করে। আবার আগাছা ও দমন করে। বর্তমানে ধানের জমিতে আন্তকর্ষণের জন্য রাইস উইডার ব্যবহার করা হয়।

চারগাছ রোপণ বা বীজ বপনের পর আগাছা ধ্বংস, চারা পাতলা করা, মাটিকে রসালো রাখার জন্য আন্তকর্ষণ করা হয়।

সাবসয়েল কর্ষণ পদ্ধতি

একটি জমিতে কয়েক বছর উপর্যুপরি আখের বা এ জাতের ফসল চাষ করলে এ ফসলগুলো জমির উপরিভাগ থেকেই খাদ্য গ্রহণ করে। কারণ এ ফসলগুলো গুচ্ছমূল বিশিষ্ট। তাই ২/৩ বছর আখ চাষ করার পর যদি জমিতে পাট চাষ করা হয় তবে ২/৩ বছর পাটের ফল খুব ভাল হয়। এ অনুশীলনগুলোর বৈজ্ঞানিক কারণ আমাদের কৃষকদের জানা না থাকলেও তারা অভিজ্ঞতা থেকেই এগুলো করে থাকে।

গুচ্ছমূল বিশিষ্ট ফসল চাষের পর লম্বা শিকড় বিশিষ্ট ফসল অথবা তার উল্টো পদ্ধতিতে সাবসয়েল কর্ষিত হয়ে থাকে।

রক্ষণশীল কর্ষণ পদ্ধতি

কর্ষণ পদ্ধতির নাম দিয়েই বুঝতে পারছেন এখানে রক্ষণশীলতা রয়েছে। আমের বা কাঁঠালের বাগান করতে সব জমি কৃষকরা চাষ করে না। যেখানে চারা লাগাবেন সে জায়গায় গর্ত করে সার, খইল দিয়ে মাটি প্রস্তুত করে নিয়ে চারা রোপন করেন। লাউ, কুমড়া চাষ করতেও শুধু চারা লাগাবর জায়গাটি বড় করে তৈরি করে চারা লাগানো হয়ে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে মাটি কাস্তে বা কোদালের সাহায্যে নাড়াচাড়া করে দিতে হয়। তাহলে এতক্ষণে রক্ষণশীল কর্ষণ পদ্ধতি কি অবশ্যই বুঝেছেন। সারা জমিতে কর্ষণের কাজ না করে শুধু প্রয়োজনীয় জায়গাটুকু কর্ষণ করাই রক্ষণশীল কর্ষণ পদ্ধতি।

সীমিত আকারের প্রয়োজনীয় জমিটুকু কর্ষণই রক্ষণশীল কর্ষণ পদ্ধতি।

শূন্যকর্ষণ পদ্ধতি

মনকে নাড়া দিচ্ছে এটা আবার কেমন কর্ষণ পদ্ধতি তাই না। শূন্যই যদি হলো তা হলে আবার কর্ষণ পদ্ধতি কেন? অনেকে হয়তো চা বাগানে যাননি বা চা বাগান দেখেননি। একবার গর্ত করে চারা লাগিয়ে ছায়া প্রদানকারী গাছ মাঝে মাঝে লাগিয়ে দিয়ে বছরের পর বছর দুটি পাতা একটি কুড়ি করে শস্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। আবার দেশের অনেক এলাকাতেই আমন ধান ক্ষেতে মাসকলাই, খেসারী অথবা সরিষা ছিটিয়ে বুনে দেয়া হয়। ধান কেটে নেবার পর শস্য আস্তে আস্তে জমির শূণ্যস্থান পূরণ করে চমৎকার ফলন প্রদান করে। এসব ফসলের জন্য কোন কর্ষণ পদ্ধতির প্রয়োজন হয়নি। কর্ষণ পদ্ধতি ছাড়া শস্যের আবাদই শূন্য কর্ষণ পদ্ধতি।

কোন প্রকারের কর্ষণ ছাড়া শস্য উৎপাদন করাই শূন্য কর্ষণ পদ্ধতি। যেমন- ধান ক্ষেতে সরিষার চাষ, চায়ের বাগান একবার লাগিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ফসল পাওয়া।

সোপান পদ্ধতি

চারা গাছ রোপণের দূরত্ব অনুসারে কিছু অংশ চাষ না করে লম্বালম্বি ফালি করে জমি চাষ করাকে সোপান চাষ পদ্ধতি বলে। আম, কাঁঠাল, পেয়ারা ইত্যাদি শস্যের বাগানের জন্য এ পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

জমিতে সারি করে নির্ধারিত জায়গা কর্ষণ করে গাছ লাগানোই সোপান কর্ষণ পদ্ধতি।

বিভিন্ন কর্ষণ যন্ত্রপাতি

বলুনতো আমাদের দেশে প্রচলিত কর্ষণ যন্ত্রপাতিগুলো কি কি? এগুলো প্রায় সকলেরই পরিচিত। নিচে কিছু কর্ষণ যন্ত্রপাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা হলো–

দেশী লাঙ্গল

দেশী লাঙ্গল সাধারণ কাঠের তৈরি। লাঙ্গলের মূল কাঠামো এক হলেও কাঠামোর অংশ বিশেষের গঠন কিছুটা আলাদা দেখা যায়। এ লাঙ্গলের মূল কাঠামোর আগার দিকে লোহার ফলক থাকে। মধ্যভাগে ছিদ্র করে ঈশ লগানো হয়। ঈশের সাথে আরেক খণ্ড কাঠও থাকে ঈশের কৌণিক পরিবর্তনের জন্য। এ খণ্ডটিকে খিল বলা হয়। মূল কাঠামোর উপরের অংশকে হাতল বলে। হাতলের উপরের ভাগকে কুটি বলে। হাতে ধরার জন্য এ কুটি ব্যবহৃত হয়। কুটি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের হয়। ঈশের অগ্রভাগের নিচের দিকে খাঁজ কাটা থাকে। এই খাজের সাথে রশি দিয়ে জোয়ালের সাথে লাঙ্গল বাঁধা হয়। অনেক সময় ঈশ কাঠের পরিবর্তে পাকা শক্ত বাঁশ দিয়েও তৈরি করা হয়।

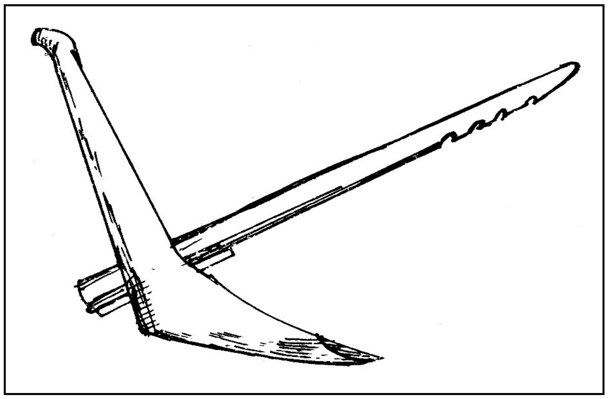

চিত্র ৮.২.১: দেশী লাঙ্গল।

দেশী লাঙ্গলে কাঠের বক্র কাঠামো এবং একটি ঈশ থাকে। কাঠামোর মাঝামাঝি জায়গায় ঈশ সংযোগ করা হয়।

জোয়াল

লাঙ্গল, আচড়া, মই ইত্যাদি টানার জন্য কাঠ বা বাঁশের এক ধরনের মজবুত দন্ড তৈরি করা হয়। এই দন্ড গরু মহিষের কাধে কৌশলে বেঁধে তার সাথে লাঙ্গল, আচড়া মই ইত্যাদি বাঁধা হয়।

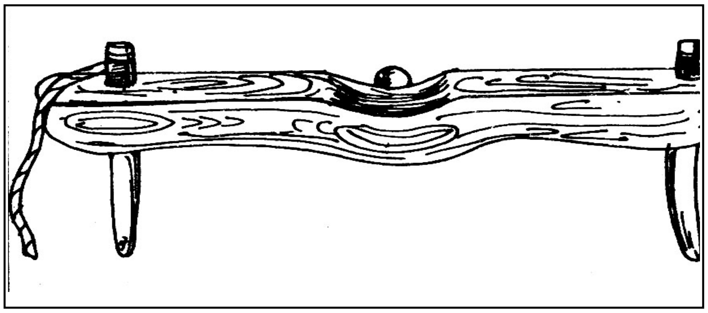

চিত্র ৮.২.২: জোয়াল।

জোয়াল কাঠ বা বাঁশের মজবুত দন্ড। লাঙ্গল, মই এবং আচড়ার সাথে জোয়াল যুক্ত করে গরু বা মহিষের কাঁধে বেঁধে দেওয়া হয়।

দেশী লাঙ্গলের সুবিধা ও অসুবিধা দুটোই রয়েছে। সুবিধাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো–

দেশী লাঙ্গলের সুবিধা

- দেশী লাঙ্গলের ওজন কম। কৃষকগণ তা সহজে দূর দূরান্তে বহন করতে পারে।
- আমাদের দেশের অধিকাংশ গরু আকারে ছোট এবং দুর্বল। এরা দেশী লাঙ্গল সহজে টানতে পারে।
- দেশী লাঙ্গল ছোট ছোট ভূ-খন্ডে ব্যবহার করা যায়।
- দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে জমি কাদা করা খুব সহজ।
- দেশী লাঙ্গল স্থানীয় দ্রব্যাদি দ্বারা তুলনাম লকভাবে কমদক্ষ মিস্ত্রিরা তৈরি করতে পারে।
- দেশী লাঙ্গলের মেরামত কৃষকরা নিজেরাই করতে পারে।

দেশী লাঙ্গলের অসুবিধা

দেশী লাঙ্গলের অসুবিধা

- দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে মাটি গভীরভাবে চাষ করা যায় না।
- দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে চাষ করতে সময় লাগে বেশী।
- দেশী লাঙ্গল অনেকদিন ব্যবহার করা যায় না, তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় বিশেষ করে ফলা ক্ষয় হয়ে যায়।
- শক্ত ও শুষ্ক মাটিতে দেশী লাঙ্গল ব্যবহার করা যায় না।
- দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে সাবধানে চাষাবাদ না করলে জমি অনাবাদী থেকে যায়।
- অসতর্কতার দরুন পশুর পায়ে আঘাত লেগে ক্ষত হবার সম্ভাবনা থাকে।

মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল

মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলকে কলের লাঙ্গলও বলা হয়। মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের মোল্ডবোর্ডের সঙ্গে হাতল এবং কুটি বা মুঠি সংযুক্ত থাকে। মোল্ডবোর্ড দেখতে পাখনার মত। এই মোল্ডবোর্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে ঈশ। ঈশ দেখতে দেশী লাঙ্গলের ঈশের মত। পাখনার মত মোল্ডবোর্ডের জন্যই এই লাঙ্গলকে মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল বলে।

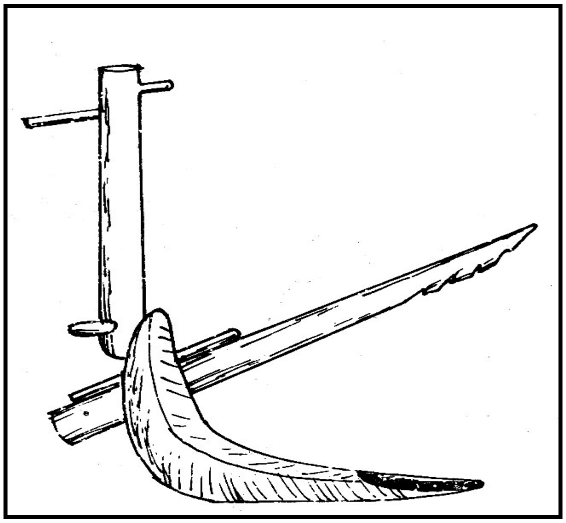

চিত্র ৮.২.৩: মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল।

সুবিধাগুলো হলো:

মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের সুবিধা

- এই লাঙ্গল দ্বারা মাটির বেশ গভীর পর্যন্ত চাষ করা সম্ভব।
- কোন জায়গা অকর্ষিত থাকে না।
- নির্ধারিত সময়ে দেশী লাঙ্গলের প্রায় তিনগুণ জমি চাষ করা যায়।
- কর্ষিত মাটি সুন্দরভাবে ওলট পালট হয়।
- শক্ত মাটি চাষ করতে এ লাঙ্গল অত্যন্ত উপযোগী।
- সবুজ সার পঁচানোর জন্য এ লাঙ্গল খুব উপযোগী।
- এ লাঙ্গল টিকে অনেক দিন।

অসুবিধাগুলো হলো:

মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের অসুবিধা

- খরচ বেশি তাই গরীব চাষীরা ক্রয় করতে পারে না।
- ছোট গরু টানতে পারে না। এজন্য গরীব চাষীরা ব্যবহার করতে পারে না।
- পাডলিং বা কাদাকরণের জন্য এ লাঙ্গল উপযোগী নয়।
- দেশী মিস্ত্রি দ্বারা এ লাঙ্গল তৈরি করা যায় না।
- কৃষকগণ এ লাঙ্গল মেরামত করতে পারে না।
- একবার খারাপ হলে মেকানিকসের মুখাপেক্ষী হতে হয়।

পাওয়ার টিলার

ধনী কৃষকরা বহুদিন থেকে আমাদের দেশের পাওয়র টিলার ব্যবহার করছেন। পাওয়ার টিলার এক ধরনের কলের লাঙ্গল। পাওয়ার টিলার মূলত দুই চাকা বিশিষ্ট একটি যন্ত্র। এর পিছনে বিভিন্ন কর্ষণ যন্ত্রপাতি সংযোগ করে চাষমই এর কাজ করা হয়। এ যন্ত্র দ্বারা সেচ ও মাড়াই এর কাজও চলে। দিন দিন পাওয়ার টিলারের ব্যবহার বাড়ছে এটা আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। এ যন্ত্র অনেক যুবক বাণিজ্যিক ভিত্তিতেও খাটাচ্ছে এটাও আপনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কথা নয়।

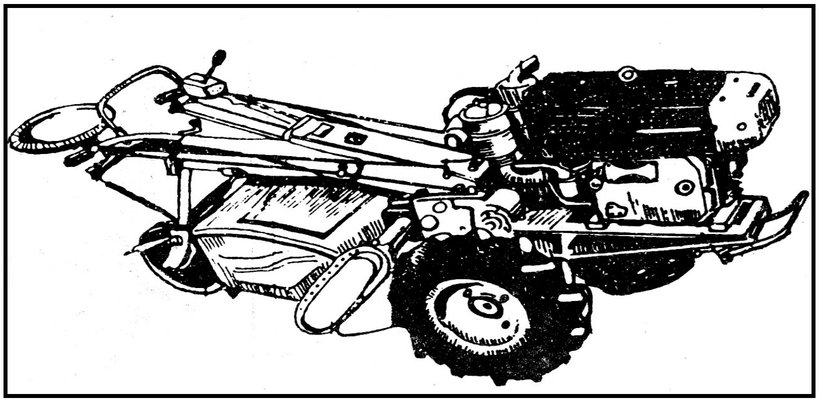

চিত্র ৮.২.৪: পাওয়ার টিলার।

পাওয়ার টিলার দু চাকা বিশিষ্ট কলের লাঙ্গল। পাওয়ার টিলারের পিছনে কর্ষণ যন্ত্রপাতি সংযোগ করে চাষমই এর কাজ করা হয়।

সুবিধাসমূহ

পাওয়ার টিলারের সুবিধা

- গভীরভাবে জমি কর্ষণ সম্ভব।
- দেশী লাঙ্গল ও মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের চেয়ে বেশি জমি চাষ করা যায়।
- পানিতে এ লাঙ্গল ব্যবহার করা যায়।
- আকারে ছোট হওয়ায় ছোট জমিতে এ যন্ত্র ব্যবহার করা যায়।
- এ যন্ত্রের সাহায্যে আগাছা দমন করা সহজ।
- ছোট রাস্তা দিয়ে জমিতে আনা নেওয়া করা যায়।
- এ লাঙ্গলে শক্ত মাটিতে ব্যবহার করা যায়।

অসুবিধাসমূহ

পাওয়ার টিলারের অসুবিধা

- এ যন্ত্রের দাম সাধারণ চাষীর নাগালের বাইরে।
- একবার নষ্ট হলে মেরামত করা ব্যয়সাপেক্ষ।
- সকল কৃষক নিজেরা মেরামত করতে পারে না।
- প্রশিক্ষণ ছাড়া এ যন্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব নয়।
- চালান এবং মেরামত দু'কাজের জন্যই প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
- এ লাঙ্গলের খুচরা অংশ সহজে পাওয়া যায় না।

ট্রাক্টর

ট্রাক্টর চার চাকা বিশিষ্ট ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিনের পিছনে লাঙ্গল, হ্যারো ইত্যাদি সংযোগ করা যায়। যান্ত্রিক চাষাবাদের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র ট্রাক্টর ব্যবহার করা হয়। সমবায় খামার এবং বড় কৃষকদের জমি পাওয়ার ট্রিলারের সাহায্যে চাষ করা হয়। অতি অল্প সময়ে ট্রাক্টরের সাহায্যে অনেক জমি চাষ করা হয়। তবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ট্রাক্টর ব্যবহারের উপযোগিতা অনেক কম। ট্রাক্টর মালামাল পরিবহণের জন্যও ব্যবহার করা যায়।

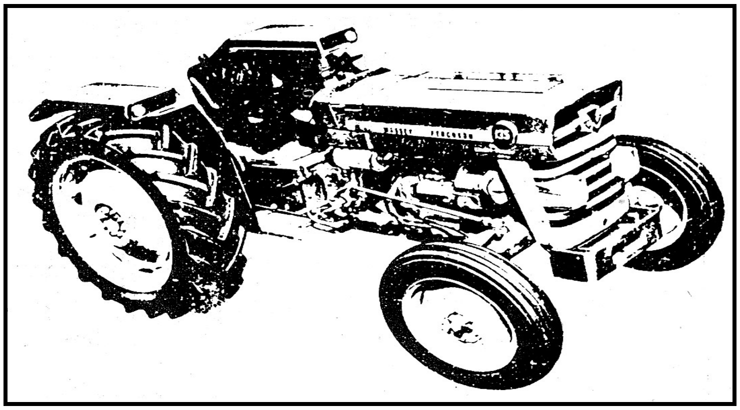

চিত্র ৮.২.৫: ট্রাক্টর।

ট্রাক্টর চার চাকা বিশিষ্ট ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিনের পিছনে লাঙ্গল, হ্যারো ইত্যাদি সংযোগ করা অল্প সময়ে অনেক জমি চাষ করা যায়।

সুবিধাসমূহ

ট্রাক্টরের সুবিধা

- অল্প সময়ে অধিক জমি চাষ করা সম্ভব।
- জমির কোন অংশ অকর্ষিত থাকেনা।
- সুন্দরভাবে মাটি ওলট পালট হয়ে থাকে।
- আলো বাতাস মাটির ভিতর প্রবেশ করতে পারে।
- খুব শক্ত মাটিও চাষ করা সম্ভব।
- অতি সহজে আগাছা দমন সম্ভব।
- ট্রাক্টরের সাহায্যে সেচ যন্ত্র, মাড়াই যন্ত্র এবং পরিবহণ যন্ত্র ব্যবহার করা যায়।

অসুবিধাসমূহ

ট্রাক্টরের অসুবিধা

- ট্রাক্টরের দাম অত্যধিক বেশি বিধায় সাধারণ কৃষকরা ক্রয় করতে সক্ষম নয়।
- ছোট ছোট প্লটে ট্রাক্টর চালনা সম্ভব নয়।
- ভাল প্রশিক্ষণ না থাকলে ট্রাক্টর চালনা এবং সংরক্ষণ কোনটাই সম্ভব নয়।
- মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সাপেক্ষ।
- খুচরা যন্ত্রাংশ সহজলভ্য নয়।

অন্যান্য কর্ষণ যন্ত্রপাতি

উল্লেখিত যন্ত্রপাতি ছাড়া ভূমিকর্ষণের জন্য অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দেশী যন্ত্র পাতি হলো মই, আচড়া, কোদাল, নিড়ানী ও খুরপী, কাস্তে, দা, জাপানী আগাছা নিড়ানী যন্ত্র এবং হস্ত চালিত নিড়ানী যন্ত্র। শেষের দুটি যন্ত্র ছাড়া অন্যগুলো আপনাদের সকলেরই পরিচিত। শেষোক্ত দুটিও অনেক এলাকায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় বিধায় অনেকেরই এগুলোর সাথে পরিচয় থাকতে পারে।

মই

মই সরাসরি কর্ষণ যন্ত্র নয় কিন্তু কর্ষণ কাজে অত্যাধিক সহায়ক যন্ত্র। মই বাঁশ বা কাঠ দ্বারা তৈরি করা হয়। দুই বা তিন খণ্ড লম্বা বাশ খাট মজবুত বাঁশ দ্বারা আটকিয়ে মই তৈরি করা হয়। মাটি সমান, ঢিলা ভাঙ্গা, মাটি চ্যেপে দেয়া ইত্যাদি কাজের জন্য মই-এর সাথে রশি বেঁধে জোয়ালের সাথে বেঁধে দিতে হয়।

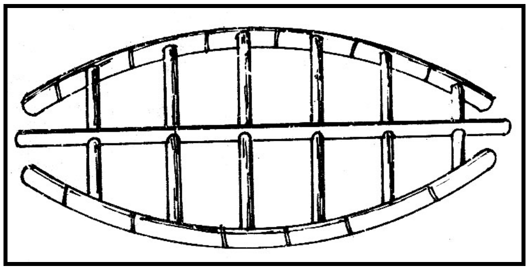

চিত্র ৮.২.৬: মই।

মই বাঁশ বা কাঠের তৈরি হতে পারে। মই মাটি সমতল করা, ঢিলা ভাঙ্গা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। বাঁশের মই আমাদের দেশে বেশি প্রচলিত।

নিড়ানী বা খুরপী

নিড়ানী বা খুরপী খুব ছোট কিন্তু অত্যাবশকীয় কর্ষণ যন্ত্র। আগাছা উঠানো, চারা পাতলা করা, মাটির উপরের শক্ত আচড় ভেঙ্গে ঝুরঝুরে করায় নিড়ানী বা খুরপীর জুড়ি নেই। গাছের মূল ছাটাই এবং মাটির সাথে সার মিশিয়ে দেবার জন্য নিড়ানী বা খুরপী অত্যাবশক।

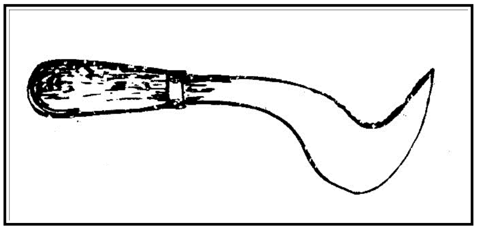

চিত্র ৮.২.৭: নিড়ানী বা খুরপী।

বিভিন্ন আকারের তৈরি লোহার ফলকের সাথে কাঠের ছোট বাট লাগানো একটি যন্ত্রই নিড়ানী বা খুরপী।

আচড়া বা বিদা

কৃষকগণ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে পাট এবং আউশ ধান ক্ষেতে চিরুণীর মত এক ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করে। আচড়া বা বিদায় কাঠের মূল কাঠামোতে বাঁশ বা লোহার খিল লাগানো হয়ে থাকে।

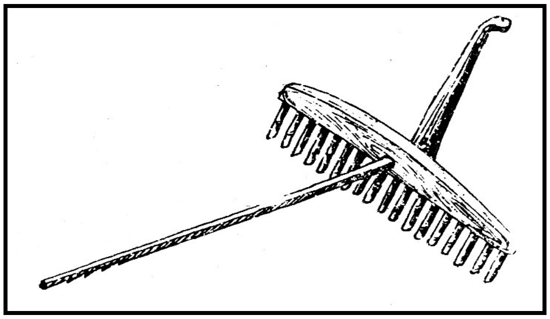

চিত্র ৮.২.৮: আচড়া।

আচড়া বা বিদা মাটির উপরিভাগের আস্তর ভেঙ্গে ঝুর ঝুরে করা, আগাছা দমন এবং চারা পাতলা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। আচড়ার মূল কাঠামোর মধ্যখানে বড় একটি ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্রে লাঙ্গলের মত ঈশ লাগানো থাকে। ঈশ জোয়ালের সাথে বেধে দিয়ে টানা হয়।

কাঠের বডিতে বাঁশ বা লোহার খিল লাগান চিরুণীর মত কর্ষণ যন্ত্র। আগাছা পরিষ্কার মাটি নাড়াচাড়া করা এবং চারা পাতলা করার জন্য এ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

কাস্তে

ধান বা গম কাটার জন্য কাস্তে ব্যবহৃত হয় এটা আপনাদের সকলের জানা।

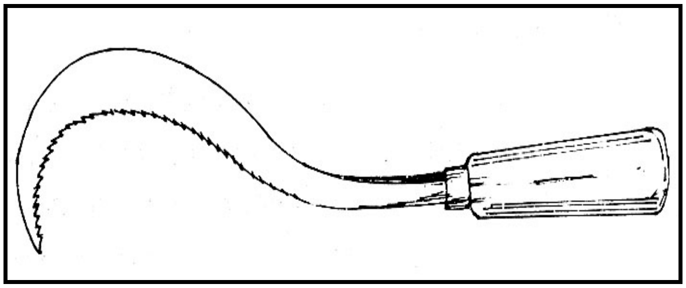

চিত্র ৮.২.৯: কাস্তে।

সুবিধামত বাকা লোহার ফলকের সাথে কাঠের আছাড় লাগিয়ে কাস্তে তৈরি করা হয়। কাস্তে বিভিন্ন রকমের হতে পারে।

জাপানী আগাছা নিড়ানী যন্ত্র

জাপানী আগাছা নিড়ানী যন্ত্র উন্নত মানের নিড়ানী যন্ত্র। সারিতে লাগানো ধানের মাঠের আগাছা পরিষ্কার এবং মালচিং এর জন্য এ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এটা শুধু ভিজা মাটিতে ব্যবহার করা হয়।

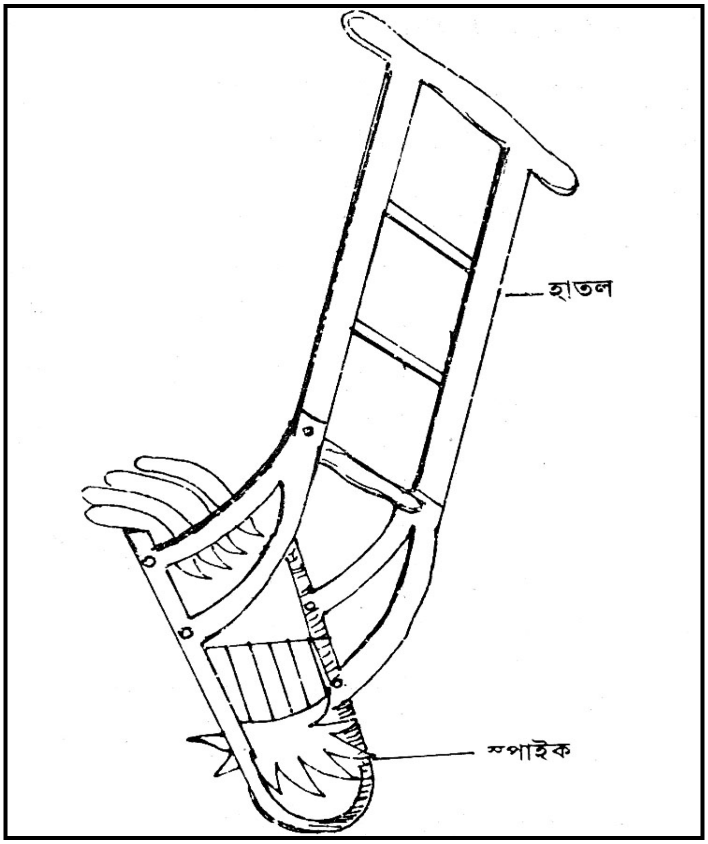

চিত্র ৮.২.১০: উন্নতমানের নিড়ানী যন্ত্র।

যন্ত্রটি লোহার তৈরি। যন্ত্রের দুটি হাতলের অগ্রভাগে লোহার বাকানো টাইন থাকে। এ টাইনেই আগাছা পরিষ্কার করে।

হস্তচালিত চাকাযুক্ত নিড়ানী

এ যন্ত্রটিও লোহা দ্বারা নির্মিত। লোহার হোয়িলের সাথে বাঁকা টাইন লাগানো থাকে। হোয়িলের সাথে ২টি হাতল থাকে। সারিবদ্ধভাবে বপনকৃত জমির আন্তর ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য এ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

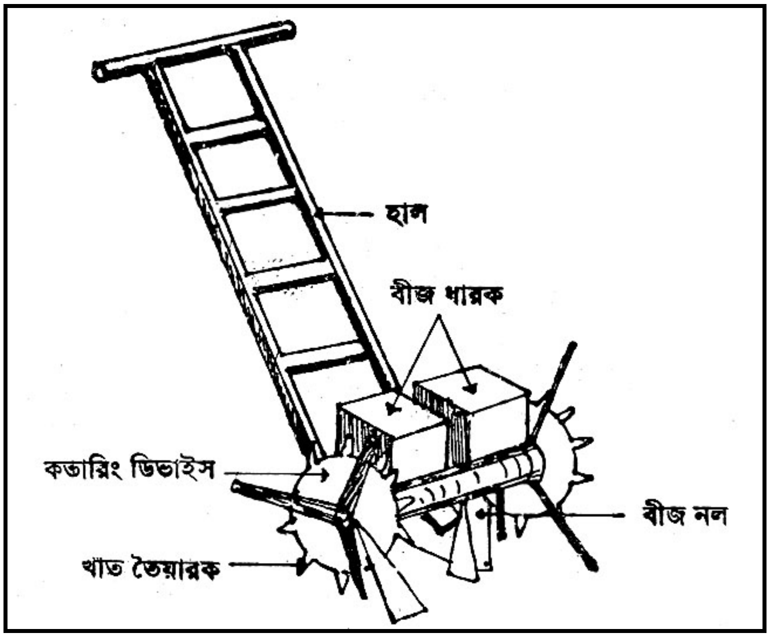

চিত্র ৮.২.১১: হস্তচালিত চাকাযুক্ত নিড়ানী।

বীজ বপন যন্ত্র

বীজের অপরে রোধ বা ইপ্সিত দূরত্বে বীজ বপনের জন্য আজকাল বীজ বপন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এটা লোহার দু'চাকা বিশিষ্ট যন্ত্র বিশেষ। এ যন্ত্রে একটি লোহার ড্রাম থাকে। যন্ত্রের পিছনে হাতল থাকে। হাতল দ্বারা যন্ত্রটি চালানো হয়। যন্ত্রটি চলার সময় মাটিতে ছোট ছোট নালার সৃষ্টি হয় এবং ড্রাম থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে বীজ পড়তে থাকে।

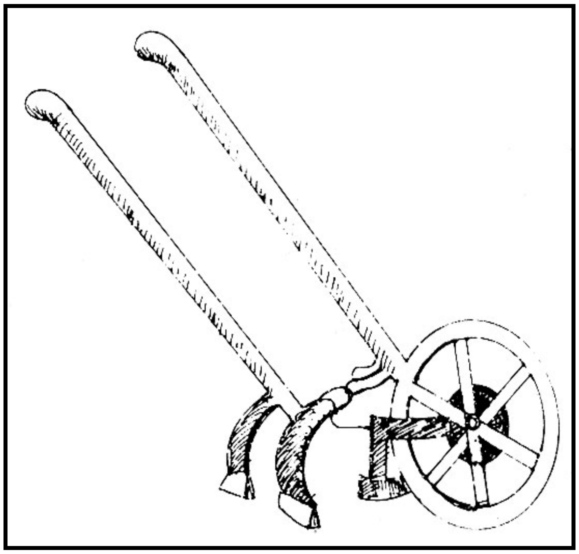

চিত্র ৮.২.১২: হস্তচালিত বপনযন্ত্র।

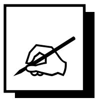

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে এক (ক) বৃত্তায়িত করুন)।

১. ভূমির কর্ষিতাবস্থা কি?
ক. ভূমিতে ছোট ছোট নালা তৈরি করা
খ. ভূমির ভৌতিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন
গ. ভূ-পৃষ্ঠস্থ আস্তর ভেঙ্গে দেয়া
ঘ. মাটির সাথে সার মিশিয়ে দেওয়া।

২. ধান চাষের চেয়ে পাট চাষের জন্য গভীরভাবে কর্ষণের প্রয়োজনীয়তা কেন?
ক. পাট গাছের খাদ্যের প্রয়োজন বেশি
খ. পাট গাছ সহজে মাটি থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না
গ. পাট গাছের শিকড় মাটির অনেক নিচে যায়
ঘ. গভীরভাবে কর্ষিত জমিতে পাটগাছ সহজে দাড়িয়ে থাকতে পারে।

৩. ভূমিকর্ষণ কিভাবে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে?
ক. কর্ষণের ফলে জমিতে প্রকৃতি থেকে সার জমা হয়
খ. কর্ষণের দরুন মাটির সার পদার্থ গাছের নাগালের মধ্যে এসে যায়
গ. কর্ষিত জমির আগাছা পচে গিয়ে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে
ঘ. কর্ষিত জমির উর্বরতা বৃদ্ধিকারক অণুজীবের বংশবৃদ্ধি তাড়াতাড়ি ঘটে।

৪. কর্ষণের ফলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় কেন?
   ক. মাটির ভৌত অবস্থার পরিবর্তন ঘটে বলে
   খ. মাটির রাসায়নিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য
   গ. মাটির জৈব অবস্থার পরিবর্তনের জন্য
   ঘ. মাটিতে অধিক পরিমাণে শেওলা ও ছত্রাক জন্মানোর দরুন।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শস্য উৎপাদনে ভূমি কর্ষণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
২. প্রধান কর্ষণ যন্ত্রপাতি কি কি?
৩. মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের বর্ণনা দিন।
৪. মই-এর কাজগুলো উল্লেখ করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। গ, ৩। গ, ৪। ক।

পাঠ ৩

সার ও সারের শ্রেণিবিভাগ, ফসল উৎপাদনে সারের প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- সার কি বলতে পারবেন;
- সারের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন;
- ফসল উৎপাদনে সারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- সারের প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

সার

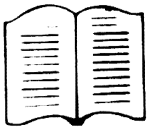

প্রাণীর মত বেঁচে থাকার জন্য উদ্ভিদেরও খাদ্য প্রয়োজন। কাঙ্খিত মাত্রায় ফসল উৎপাদনের জন্য উদ্ভিদকে পর্যাপ্ত মাত্রায় খাদ্য প্রদান করতে হয়। গাছ এ খাদ্য পায় কোত্থেকে? সার এ খাদ্য সরবরাহ করে। তা হলে আমরা বলতে পারি জমির উর্বরা শক্তি রক্ষা করে ও হারানো শক্তি ফিরিয়ে সুস্থভাবে গাছপালা জন্মাবার উপযোগী করার জন্য যে জৈব ও অজৈব পদার্থ প্রয়োগ করা হয় তাকেই কৃষিবিজ্ঞানীরা সার বলে। বর্তমান জগতে দ্রত বর্ধিত জনসংখ্যাকে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহের জন্য কৃষি উন্নয়ন অপরিহার্য। তাই পৃথিবীব্যাপী নতুন নতুন সার উৎপন্ন করছে এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি ঠিক রেখে সারের ব্যবহার ক্রমশ বেড়ে চলছে। অবশ্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সার প্রয়োগের জ্ঞানের অভাবে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিতে সার ব্যবহার করা হচ্ছে। যার ফলে জমির উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হচ্ছে।

সার জমির উর্বরাশক্তি রক্ষা করে হারানো শক্তি ফিরিয়ে আনে এবং গাছকে খাদ্য সরবরাহ করে ফসলের উৎপাদন বাড়ায়।

সারের শ্রেণীবিভাগ

উৎসের উপর ভিত্তি করে সারকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

- জৈব সার
- অজৈব বা রাসায়নিক সার।

জৈব সার

বিভিন্ন প্রকার জীব যেমন গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী ও গাছ-পালার দেহ থেকে যে সার পাওয়া যায় তাকেই জৈব সার বলে। জৈব সার সম্পর্কে একটু চিন্তা করুন। এটা কি বস্তু? বাস্তবিক পক্ষে সকল জীবই মৃত্যুর পর জৈব সারে পরিণত হয়। আবার অনেক জীব জীবিত থেকেও জৈব সার সরবারাহ করে থাকে, যেমন- মানুষের মল, ছাগল, গরু, হাস-মুরগীর বিষ্ঠা, গাছ পালার ঝরা পাতা সবই কিন্তু জৈব সার। শস্য উৎপাদনের ভিত্তি মাটি। এই মাটিকে সতেজ রাখতে এবং শস্য উৎপাদন বাড়াতে জৈব সার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

জৈব সারের ভূমিকা

- জমির উর্বরতা রক্ষা এবং বৃদ্ধিতে জৈব সার অপরিহার্য।
- রাসায়নিক সারের অপর্যাপ্ততার সময় জৈব একইভাবে অপরিহার্য।
- জমিতে পর্যাপ্ত জৈব সার বিদ্যমান থাকলে রাসায়নিক সার গাছের নাগালের বাইরে চলে যায় না।
- জৈব সার মাটির ক্ষয়রোধ করে।
- জমিতে জৈব সার পর্যাপ্ত থাকলে মাটিতে রস থাকে।
- পর্যাপ্ত জৈব সার শিলাময় বা বেলে মাটিকে উর্বর মাটিতে পরিণত করে।
- পর্যাপ্ত জৈব সারের বর্তমানে মাটিতে কেঁচো এবং অন্যান্য পোকা মাকড় ও ব্যাকটেরিয়া জাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণী প্রচুর জন্মে এবং মাটিকে উর্বর করে। কোন কোন প্রাণী যেমন কেঁচো মাটির নিচের অংশ থেকে খণিজ পদার্থ উপরে নিয়ে আসে এবং জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে।

জৈব পদার্থ থেকে জৈব সার তৈরি হয়। এ সার মাটির উর্বরতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করে। জৈব সার মাটিকে রসাল রাখে। জৈব সার মাটিকে বিষাক্ততার হাত থেকে রক্ষা করে। জৈব সার মাটির ক্ষয়রোধ করে।

জৈব সারের শ্রেণিবিভাগ

আপনরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন ভাল কৃষকগণ কোন প্রকার আবর্জনা, আগাছা, গোবর চোনা, গরু মহিষের অভুক্ত খাদ্য কোনটাই ফেলে দেয় না। এগুলোকে পচিয়ে জৈব সারে পরিণত করে। উদ্ভিদ, আবর্জনা ও মলমূত্রের উৎসের উপর ভিত্তি করে জৈব সারকে নিচে উল্লিখিত উপায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে।

আবর্জনা পচা সার

খড়, কুটা, গাছের পাতা, কচুরী পানা, আগাছা ইত্যাদি উচু জায়গায় গাছের নিচে স্তরে স্তরে পচিয়ে জৈব সার তৈরি করা হয়। জৈব সার তৈরির সময় গোবর ও চোনার মিশ্রণ বা ইউরিয়া ও হাড়ের গুড়া অথবা ট্রিপল সুপর ফসফেট স্তরে স্তরে দিয়ে সময় সময় পানি দিলে ঐগুলো তাড়াতাড়ি জৈব সারে পরিণত হয়।

আবর্জনা জৈব সারে পরিণত হতে ৩–৪ মাস সময় লাগে। জৈব সার তৈরির সময় মনে রাখতে হবে যে, ৩/৪ সপ্তাহ পর পর সারের স্তরগুলো উল্টিয়ে দিতে হবে। বলুনতো এ উল্টানোর প্রয়াজন কি? কারণ আবর্জনা পচানোর জন্য বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক কাজ করে। সার ঠিকমত তৈরি হয়ে গেলে জমিতে প্রয়োগ করতে হয়।

বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা ও আগাছা ফসফেট ও ইউরিয়ার সাথে মিশিয়ে উচু জায়গায় আবর্জনা পচা সার তৈরি করা যায়। সার ঠিকমত তৈরি হয়ে গেলে জমিতে প্রয়োগ করতে হয়।

সবুজ সার

যে সকল গাছ তাড়াতাড়ি বড় হয় এবং অতি সহজে পচে যায় ঐগুলো দিয়ে সবুজ সার তৈরি হয়ে থাকে। ডাল পরিবারভুক্ত অনেক গাছ সবুজ সার তৈরির জন্য উত্তম। তার কারণ কি? একটু চিন্তা করে বলুন। ডাল জাতের গাছের শিকড়ে গোটা ধরনের এক রকম আকৃতি গঠিত হয়। যার ভিতর লিগিউম ব্যাকটেরিয়া নামে এক জাতের ব্যাকটেরিয়া বাস করে। এ জাতের ব্যাকটেরিয়া বৃষ্টির জল দ্বারা নীত নাইট্রোজেন ধরে গাছে জমা করে। লিগিউম ব্যাকটেরিয়া শিম জাতীয় গাছ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে এবং গাছকে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। পরস্পরকে খাদ্য দিয়ে বেঁচে থাকার এ পদ্ধিতিকে সিমবায়োসিস বলে। শণ, ধইঞ্চা, বরবটি ইত্যাদি গাছের সাহায্যে সবুজ সার তৈরি করা যেতে পারে।

নরম সবুজ গাছাপালা ফুল আসার আগে মাটিতে পচিয়ে জৈব সার তৈরি করা হয়। লিগিউমিনাস গাছ এ ব্যাপারে উত্তম। ধইঞ্চা, বরবটি এ উদ্ভিদগুলো সবুজ সারের ভাল উপকরণ।

খামারজাত সার

গরু, ছাগল, হাস-মুরগি ও অন্যান্য প্রাণীর মলমূত্রকে খামারজাত সার বলে। খামারজাত সারে ফসলের সকল প্রকার খাদ্য বিভিন্ন পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। এদের মধ্যে নাইট্রোজেন শতকরা ০.৫০ ভাগ, ফসফরাস পেন্টা অক্সাইড শতকরা ০.২৫ ভাগ এবং পটাসিয়াম অক্সাইড শতকরা ০.৫০ ভাগ। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আমাদের দেশে খামারজাত সার সংরক্ষণ করা হয় না এবং এ ব্যাপারে কৃষক ও জনগণ সচেতন নন। খামারজাত সারের খাদ্যমান ঠিক রাখতে হলে নিম্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে–

গরু, ছাগল ও হাঁস-মুরগীর থাকার ঘর এরূপভাবে তৈরি করা প্রয়োজন যেন অতি সহজে বিষ্ঠা সংগ্রহ করা যায়। গরু ছাগলের ঘরের ক্ষেত্রে মেঝে পাকা করতে না পারলেও এঁটেল মাটি দিয়ে শক্ত করে পিটিয়ে নিতে হবে। এ পিটানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটু ভাবুনতো? কেন পেটানো দরকার। নরম মাটিতে চোনা সহজে মাটি কর্তৃক শোষিতে হয় এতে সারের খাদ্যমান অনেক কমে যায়। চোনা যাতে দূরে সরে না যায় সে জন্য ঘরের মেঝেতে খরকুটা দেওয়া প্রয়োজন। মেঝেটা চারদিকে ক্রমশ ঢালু করে চারদিকে নালা কেটে ঘরের এক কোণে গর্ত করে চোনা সংগ্রহ করা যায়। চোনা ও গোবর একসাথে গর্তে রাখতে হবে। গর্তের মধ্যে ট্রিপল সুপার ফসফেট ছিটিয়ে দিলে সারের পচন সহজ হয়।

খামারজাত সারের পূর্ণ খাদ্যমান বজায় রাখতে হলে এ সার রক্ষার জন্য বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে গর্ত করে নিতে হবে। গর্ত পাকা করে নিতে পারলে উত্তম। কিন্তু তা ন পারলে গর্তটাকে এরূপভাবে করা উচিত যেন বৃষ্টির পানি বা বন্যার পানি গর্তে না ঢোকে, গর্তের পানি যেন উপচিয়ে বেরিয়ে না যায়, সরাসরি রোদ্র না লাগে এবং বৃষ্টির পানি না পড়ে।

গর্তের পার্শ্ব ও নিচদিক উত্তমরূপে পিটিয়ে এটল মাটি দিয়ে লেপে দিতে হবে। গর্তের চারদিকে আইল ও উপরে চালা দেওয়া প্রয়োজন।

গো মহিষাদির মলম ত্র খড়কুটা একসাথে পচিয়ে খামারজাত সার তৈরি করা হয়। গোশালার ভিটি ক্রমশ চারদিকে ঢালু করে। মূত্র সংরক্ষণ করা যায়। খামারজাত সার সংরক্ষণ গর্তের পর উঁচু করে উপরে চালা দেওয়া প্রয়োজন। সার উত্তমরূপে তৈরি ফসলের জমি তৈরির শেষ দিকটায় জমিতে প্রয়োগ করতে হয়।

অজৈব বা রাসায়নিক সার

বলুনতো রাসায়নিক সার কি? রাসায়নিক সার কি দেখেছেন? কলকারখানায় কৃত্রিম উপায়ে রাসায়নিক সার তৈরি হয়ে থাকে। আপনারা সকলেই ইউরিয়া, ফসফেট এবং পটাশ সার দেখেছেন। প্রায় সকল কৃষক এবং কৃষক পরিবার এ সবগুলোর সাথে পরিচিত। এগুলো আমাদের দেশে ঘোড়াশাল, ফেঞ্চুগঞ্জ, আশুগঞ্জ এবং চট্টগ্রামে বড় বড় ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়ে থাকে। এই সারগুলো একটি অন্যটির পরিপ রক হিসেবে কাজ করে না। এদের প্রত্যেকটির কাজ আলাদা। শস্যের ভাল ফলন তখনই আশা করা যায় যখন তাদেরকে সুষম মাত্রায় ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ফসলের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সারগুলো হলো–

- নাইট্রোজেন জাতীয়
- ফসফরাস জাতীয়
- পটাশ জাতীয়।

সারের প্রয়োজনীয়তা

নাইট্রোজেন জাতীয় সার

বায়ুমণ্ডলের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ নাইট্রোজেন। শিম জাতীয় গাছ ছাড়া উচ্চ শ্রেণির অন্য কোন গাছ বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না। নাইট্রোজেনকে গাছের খাদ্যোপযোগী করতে হলে অন্য মৌলিক পদার্থের সাথে মিশিয়ে যৌগিক পদার্থে পরিণত করতে হয়।

নাইট্রোজেনের পরিমিতি ব্যবহার: পরিমিত ব্যবহার করা হলে নাইট্রোজেন গাছের পাতাকে সবুজ ও সতেজ করে ফলে গাছ সূর্যালোকে বাতাস থেকে প্রচুর খাদ্য উপাদান গ্রহণ করতে সমর্থ হয় ও মাটি থেকে গৃহীত উপাদানের সমন্বয়ে প্রচুর খাদ্য তৈরি করতে পারে। গাছের শিকড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং শিকড় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গাছ অধিক পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করে সতেজ ও সবল হয়।

নাইট্রোজেনের অভাব: নাইট্রোজেনের অভাবে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি কমে যায়। পাতা প্রথমত হাল্কা সবুজ এবং পরে হরিদ্রাব হয়ে যায়। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে না।

নাইট্রোজেনের আধিক্যঃ নাইট্রোজেনের আধিক্য গাছের আঙ্গিকে বৃদ্ধি বেশি হয়। অল্প বাতাসে গাছ হেলে পড়ে। ফুল ও ফল ধরতে সময় বেশি লাগে। গাছে রোগ ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ বেশি হয়।

কয়েকটি নাইট্রোজেন জাতীয় সারঃ অ্যামোনিয়াম সালফেটে শতকরা ২০.৫ ভাগ নাইট্রোজেন, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটে শতকরা ৩২.৫ ভাগ নাইট্রোজেন, ইউরিয়ায় শতকরা ৪২.৫৬ ভাগ নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম নাইট্রেট শতকরা ১৭.০০ ভাগ নাইট্রোজেন, অ্যামোনিয়াম ফসফেটে শতকরা ১২ ভাগ নাইট্রোজেন।

নাইট্রোজেন উদ্ভিদের একটি অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য। এই খাদ্য কোন কোন গাছ প্রকৃতি থেকে বিশেষ কায়দায় পেয়ে থাকে। তবে বেশির ভাগ গাছ জৈব ও অজৈব সার থেকে এ খাদ্য গ্রহণ করে। গোবর, আবর্জনা, পচা জৈব সার এবং ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম সালফেট ইত্যাদি রাসায়নিক বা অজৈব সার। নাইট্রোজেন গাছের সুষম বৃদ্ধিতে অত্যাবশ্যক।

ফসফরাস জাতীয় সার

গাছের বৃদ্ধি ও ফলন প্রদানে ফসফরাস জাতীয় সারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গাছকে ফুলে ফলে সুশোভিত পেতে হলে অত্যন্ত যত্নের সাথে জমিতে ফসফরাস জাতীয় সার ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক।

ফসফরাস জাতীয় সারের পরিমিত ব্যবহারঃ ফসফরাস গাছের শিকড় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ফলে গাছ অধিক খাদ্য গ্রহণে সক্ষম হয়। জমিতে নাইট্রোজেন জাতীয় সার অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হলে ফসফরাস তার খারাপ কার্যাবলী সংশোধন করে। গাছে সময়মত ফুল আসতে ও পরিপুষ্ট ফল গঠনে সাহায্য করে। বীজে আমিষের ভাগ বাড়ায়। জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসফরাস বিদ্যমান থাকলে গাছ নাইট্রোজেন ও পটাশ জাতীয় সার অধিক পরিমাণে কাজে লাগাতে পারে। ফসফরাস উদ্ভিদ কোষে অম্ল ও ক্ষারের সমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

ফসফরাসের আধিক্যঃ জমিতে ফসফরাসের আধিক্য সাধারণত হয় না।

ফসফরাসের অভাবঃ ফসফরাসের অভাব হলে গাছের শিকড় বৃদ্ধি পায় না। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি কমে যায়। সময়মত ফুল আসে না। পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়। দানা জাতীয় শস্যের দানা পুষ্ট হয় না।

কয়েকটি ফসফরাস জাতীয় সারঃ ট্রিপল সুপার ফসফেটে শতকরা ৪৮ ভাগ ফসফরিক এসিড, হাড়ের গুড়ায় শতকরা ১৫ ভাগ ফসফরিক এসিড, অ্যামোনিয়াম ফসফেটে শতকরা ৬৭ ভাগ ফসফরিক এসিড থাকে।

নাইট্রোজেনের মত ফসফরাস ও জৈব ও অজৈব পদার্থ থেকে পাওয়া যায়। টিএসপি ফসফরাস জাতীয় রাসায়নিক সারের উদাহরণ। গাছের শিকড় বৃদ্ধি এবং ফুল ফলের জন্য ফসফরাস অত্যাবশ্যক।

পটাশ জাতীয় সার

শক্ত সবল গাছ পাওয়ার জন্য পটাশ জাতীয় সারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পটাশ জাতীয় সারের পরিমিত ব্যবহার: পরিমিত পটাশ গাছের ডালপালা ও কাণ্ডকে শক্ত করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। পাতা থেকে গাছের বিভিন্ন অংশে খাদ্য সঞ্চারণে সাহায্য করে। বীজে খাদ্য সঞ্চয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

পটাশের আধিক্য: অধিক পরিমাণে পটাশ সার ব্যবহার করলে বিভিন্ন উপায়ে অতিরিক্ত পটাশ গাছের নাগালের বাইরে চলে যায়। তাই গাছের কোন ক্ষতি হয় না।

পটাশের অভাব: পটাশ সারের অভাবে গাছে কাণ্ডের ও শিকড়ের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। রোগ ও পোকামাকড় সহজ আক্রমণ হয়। অল্প বাতাসে গাছ পড়ে যায়। পাতার বর্ণ নীলাভ হলদে হয়ে যায়। শিরা সমূহের মধ্যবর্তী স্থান ও কিনারা শুকিয়ে যায় এবং অগ্রভাগ বাদামী বর্ণ ধারণ করে। শস্যকণা পুষ্ট হয় না।

কয়েকটি পটাশ জাতীয় সার: মিউরেট অব পটাশ শতকরা ৫০ ভাগ পটাশ অক্সাইড, নাইট্রেট অব পটাশ শতকরা ৪৪ ভাগ পটাশ অক্সাইড, সালফেট অব পটাশ শতকরা ৫০ ভাগ পটাশ অক্সাইড।

পটাশিয়াম জৈব ও অজৈব উভয় বস্তু থেকে পাওয়া যায়। মিউরেট অব পটাশ একটি অজৈব উৎস। পটাশ গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং গাছকে শক্ত করে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

সার গাছের খাদ্য। এ খাদ্য গাছের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় গাছকে দিতে না পারলে সার প্রয়োগের কার্যকারিতা কমে যায়। আর্থিক অপচয় ঘটে। সার থেকে পুরো ফায়দা উঠাতে হলে সার প্রয়োগ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। জৈব সার জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। আর রাসয়নিক সার বিভিন্ন ধাপে এবং উপায়ে ব্যবহার করলে এর কার্যকারিতা বাড়ে এবং ফসলের উৎপাদন বেশি হয়। রাসায়নিক সার প্রয়োগ নিম্নরূপ:

- **ছিটিয়ে সার প্রয়োগ**

জমি ভালভাবে চাষ মই দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে জমির সমস্ত এলাক জুড়ে সমভাবে সার ছিটিয়ে দেয়া হয়। এ পদ্ধতি দু'ভাগে বিভক্ত।

- **মৌলমাত্রা হিসেবে সার প্রয়োগ**

কৃষি বিজ্ঞানীদের নির্ধারিত মাত্রা হিসেবে জমি প্রস্তুতির সময় সার প্রয়োগকে মৌল মাত্রা বলা হয়। মৌলমাত্রা বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- পাটের মৌল মাত্রা আর ধানের মৌল মাত্রা এক নয়। আবার ঋতুভেদে একই ফসলের জন্য মৌলমাত্রা আলাদা হতে পারে।

- **উপরি প্রয়োগ**

মাঠে চারাগাছ বড় হবার পর প্রয়োজন মত রাসায়নিক সার মাঠে ছিটিয়ে ব্যবহার করা হয়। এটাই উপরিমাত্রা। উপরিমাত্রা বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

- **স্থানীয়ভাবে সার প্রয়োগ**

সারের সর্বাধিক কার্যকারিতার জন্য অনেক সময় সমগ্র জমিতে সার ব্যবহার না করে ফসলের মূলের কাছাকাছি সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। বলুনতো এ পদ্ধতিকে কি বলা হয়? বিভিন্ন উপায়ে এ সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

- **নালায় প্রয়োগ**

উন্নত পদ্ধতির আখ চাষ নালা পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। চারা লাগানোর জন্য অন্তত এক ফুট গভীর নালা করা হয়। এই নালাতে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করে সময় মত চারা লাগানো হয়। এভাবে নালায় সার প্রয়োগ করে চাষাবাদ করাকে নালা পদ্ধতি বলে।

- **ব্যাণ্ড পদ্ধতিতে প্রয়োগ**

এখন অনেক ফসলই সারি করে আবাদ করা হয়ে থাকে। জমি প্রস্তুত করে সারিতে বীজ বুনে অথবা চারা লাগিয়ে সারির দু'পাশে গর্ত করে সার প্রয়োগ করা হয়। এটাই ব্যাণ্ড পদ্ধতি। এতে সারের অপচয় কম হয় এবং গাছ পূর্ণভাবে সার কাজে লাগায়।

- **মাদায় প্রয়োগ**

অনেক ফসল চাষের জন্য সমগ্র জমি চাষের প্রয়োজন হয় না। প্রাথমিকভাবে জমিতে ২/৩টি চাষ মই দিয়ে নির্ধারিত দূরত্বে মাদা তৈরি করা হয়। সারের সর্বাধিক ব্যবহারের জন্য ঐ মাদায় সার প্রয়োগ করা হয়। এটা মাঠ ফসলের ক্ষেত্রে কম প্রযোজ্য। উদ্যানতাত্ত্বিক শস্যাদি চাষে সাধারণত মাদা তৈরি করা হয়।

- **পার্শ্ব প্রয়োগ**

প্রতিটি গাছের গোড়ায় মাটি কুপিয়ে ঝুরঝুরে করে সার মিশিয়ে দেওয়াই পার্শ্ব প্রয়োগ। বহু বর্ষজীবী গাছের বেলায় এ পদ্ধতি প্রযোজ্য।

- **তরল সার প্রয়োগ**

নির্ধারিত মাত্রায় সার তরল করে মাটিতে প্রবেশ করায়ে অথবা সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে পাতায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রয়োগকারীকে অভিজ্ঞ হতে হবে। তরল সারের ঘনত্ব পাতার আভ্যন্তরীণ রসের চেয়ে বেশি ঘন হলে পাতার রস বেড়িয়ে আসবে এবং গাছ মরে যাবে।

> **সার দুই ভাবে প্রয়োগ করা হয়। প্রথমত মৌলমাত্রা এবং দ্বিতীয়ত উপরিমাত্রা। মৌলমাত্রা জমির তৈরির সময় এবং উপরিমাত্রা বীজ বপন বা চারার রোপনের পর। উপর প্রয়োগ সাধারণত নালায়, কান্ডে, মাদায় এবং পার্শ্বে প্রয়োগ করা হয়। তরল অবস্থায়ও স্প্রে করে প্রয়োগ করা হয়**

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে এক (ক) বৃত্তায়িত করুন)।

১. আমাদের জমির উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হচ্ছে কেন?
ক. অধিক মাত্রায় সার প্রয়োগ করায়
খ. স্বল্প মাত্রায় সার প্রয়োগ করায়
গ. ত্রুটিপূর্ণ উপায়ে সার প্রয়োগের ফলে
ঘ. প্রয়োগ সময়ের জ্ঞানের অভাবে।

২. ফসল উৎপাদনের ভিত্তি কি?
ক. সার
খ. মাটি
গ. আধুনিক জ্ঞান
ঘ. রোগ প্রতিরোধক ঔষধ।

৩. জৈব সার অপরিহার্য কি কারণে?
ক. ফসলের রোগ প্রতিরোধের জন্য
খ. ফসলের পোকা দমন করতে
গ. জমির উর্বরতা রক্ষা এবং বৃদ্ধির জন্য
ঘ. ফসলের মান উন্নয়নের নিমিত্তে।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খামারজাত সার সংরক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা করুন।
২. সবুজ সার প্রস্তুত প্রণালীর বিবরণ দিন।
৩. নাইট্রোজেনের কাজগুলো লিখুন।
৪. ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণ কি কি?
৫. ফসল উৎপাদনে পটাসিয়ামের ভূমিকা কি?
৬. নালা পদ্ধতিতে সার প্রয়োগের বিবরণ দিন।
৭. মাদায় কিভাবে সার দেওয়া হয়?

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২।খ, ৩। গ।

পাঠ ৪

শস্য সংরক্ষণ ও শস্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, কীট পতঙ্গ ও রোগ বালাই দমন পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- শস্য সংরক্ষণ কি বলতে পারবেন;
- শস্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ধান ও পাটের খুব ক্ষতিকারক পোকার নাম উল্লেখ করতে এবং প্রতিরোধ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- সাধারণভাবে উদ্ভিদ রোগ দমন ও প্রতিরোধ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

শস্য সংরক্ষণ

গ্রামে হাটার সময় কোন কোন ধান জমিতে ধান গাছ বৃদ্ধির সময় কিছু কিছু গাছ সাদা হয়ে যেতে দেখা যায়। বলুনতো জায়গায় এ গাছগুলো সাদা হয়ে যায় কেন? উচ্চ ফলনশীল ধানের জমি মধ্যে মধ্যে হলদে হয়ে যায়। গাছ বড় হয় না। এর কারণ কি? আম কাঁঠালে অনেক সময় ভিতরে পোকা পাওয়া যায়। বেগুনের পোকা তো প্রায় সকলের চোখে পড়ে। এ ঘটনাগুলো থেকে বুঝা যায় আমাদের বিভিন্ন ফসল রোগ বা পোকায় আক্রমণ করে এবং এগুলোর ফলন উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে দেয়। প্রায় সব ফসলেই পোকা ও রোগের আক্রমণ হয়। বিজ্ঞান সম্মত প্রতিরোধ ও দমন পদ্ধতি দ্বারা এগুলোর হাত থেকে ফসল সংরক্ষণ করা যায়।

প্রতিরোধ ও দমন পদ্ধতি মাধ্যমে মাঠের শস্য সংরক্ষণ করা যায়।

শস্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দেশে কৃষিবিজ্ঞানীদের মতে প্রতি বছর মোট উৎপাদিত শস্যের প্রায় ১২-১৫ ভাগ শস্য পোকা মাকড় ও রোগ বালাই ধ্বংস করে থাকে। অনেক সময় রোগ ও পোকা মাকড়ের ব্যাপক আক্রমণ হলে ক্ষতির পরিমাণ মোট উৎপদিত শস্যের ২০-২৫ ভাগও হয়ে থাকে। এ ছাড়া গুদামজাত ফসলেরও অনেক শত্রু আছে। এদের দ্বারা ক্ষতির পরিমাণও আশঙ্কাজনক। বিভিন্ন প্রাণী যেমন- পাখি, শামুক, ইঁদুর, বাদুর, শিয়াল, বন্য শূকর, কাঠ বিড়ালী ইত্যাদি বিভিন্ন ফসলের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে থাকে।

শস্য ও শাক সবজির রোগ

শস্য ও শাক সবজি আমাদের দেশে বার মাসই জন্মে এবং পোকা ও রোগ বালাই এর আক্রমণ বার মাসই হয়ে থাকে। প্রধান প্রধান শস্য ও শাক সবজির পোকা মাকড় ও রোগ বালাই এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হলো:

ধানের পোকাসমূহ

ধানের অজস্র ক্ষতিকারক পোকা আছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাজরা পোকা, পামরী পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, চুঙ্গি পোকা, শীষ কাটা লেদা পোকা, গান্ধী পোকা ও থ্রিপস ইত্যাদি।

মাজরা পোকা

বাংলাদেশে মাজরা পোকা ধানের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে থাকে। মাজরা পোকা বিভিন্ন প্রকারের কাল মাথা বিশিষ্ট, হলুদ ও গোলাপী রং এর।

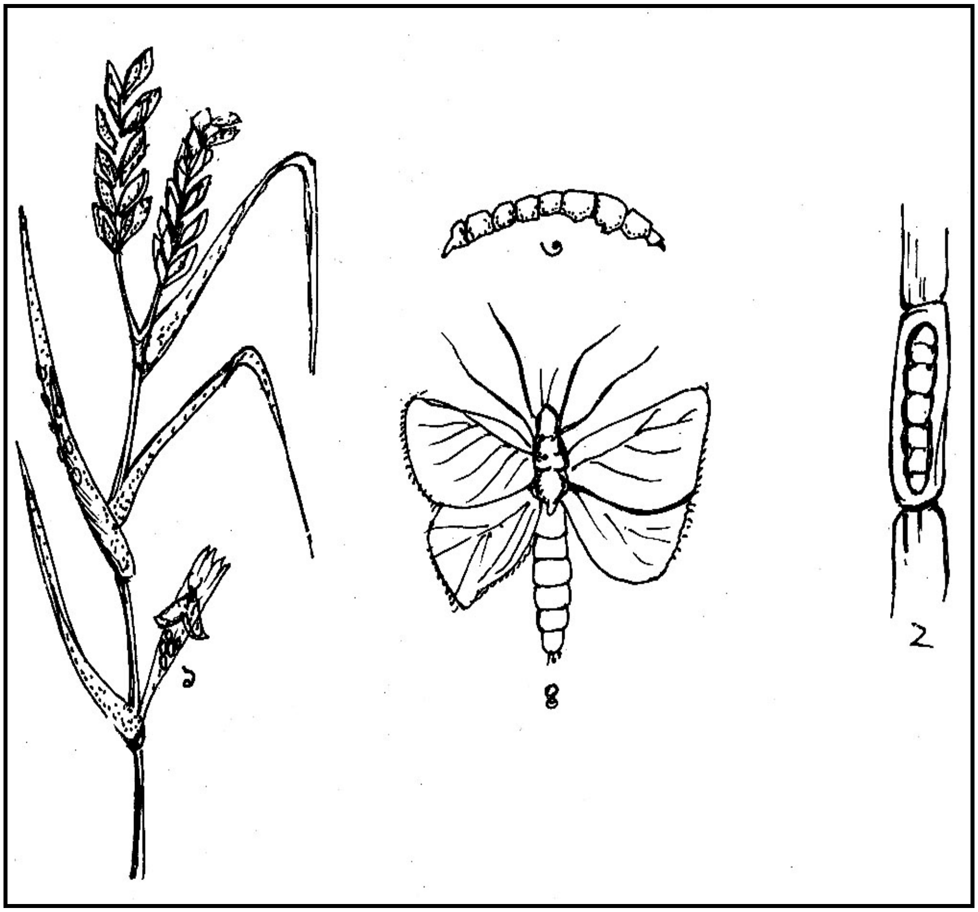

১. পাতার স্তুপাকৃত ডিম ২. কাণ্ডের ভিতর শুককীট ৩। শুককীট ৪। পূর্ণবয়স্ক মথ।

চিত্র ৮.৪.১: মাজরা পোকা।

এ পোকা সব মৌসুমেই কম বেশি ক্ষতি করে থাকে। ফুল আসার আগে আক্রমণ হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়। সাদা শীষ অর্থাৎ চাল শূন্য শীষ বেরিয়ে আসে। এ ধরনের ক্ষতি বোরো মৌসুমে বেশি হয়ে থাকে। কীড়া শীষের নিচের অংশ নরম শাস খেয়ে ফেলে। ফলে শীষ মরে যায় এবং ধান চিটা হয়ে যায়।

নিয়ন্ত্রণঃ

- জমি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পোকার সংখ্যা যখন কম থাকে ধরে মেরে ফেলা।
- পরিণত মথকে আলোর ফাঁদ দ্বারা মেরে ফেলা।
- ডিমের গাদা ধ্বংস করে ফেলা।
- ধানের আবাদ হয়ে গেলে জমির আবর্জনা ও নাড়া পুড়িয়ে ফেলা।
- কৃষি কীটতত্ত্ব বিভাগের অনুমোদিত ঔষধ ব্যবহার করা।
- জমিতে গাছের ডালা পুতে দেওয়া যাতে পাখি বসতে পারে এবং পোকা ধ্বংস করতে পারে।

পামরী পোকা

পামরী পোকা সব মৌসুমেই ধানের ক্ষতি করে থাকে। তবে আমন মৌসুমে ক্ষতির পরিমাণ বেশি। এদের কীড়া পাতার সবুজাংশ খেয়ে ফেলে ফলে জমির বিভিন্ন স্থানে সাদা সাদা খণ্ড দেখা দেয়। ডিম থেকে ৪/৫ দিনের মধ্যে কীড়া বেরিয়ে আসে এবং এরা পাতার সবুজাংশ খেতে শুরু করে। ৮-১০ দিনের মধ্যে পাতার ভিতরে পুত্তুলির আকার ধারণ করে এবং আবার ঝাকে ঝাকে নতুন পোকার জন্ম হয়।

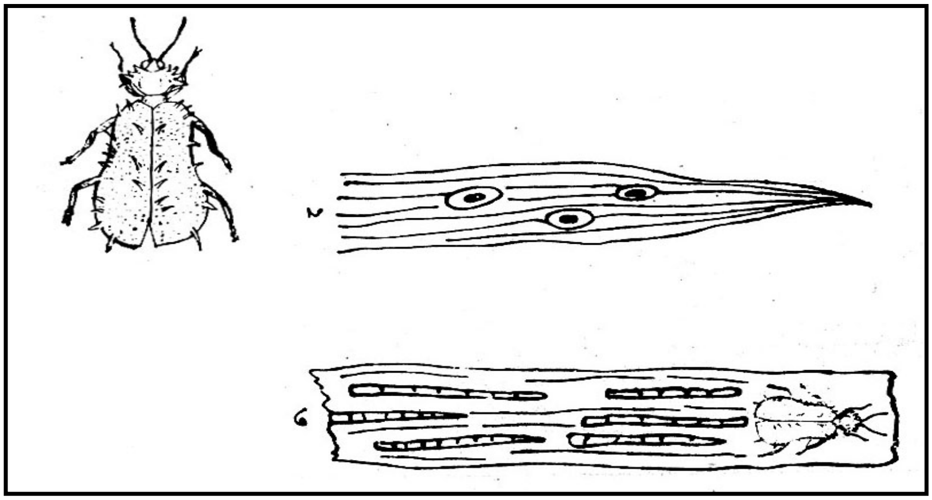

১. পূর্ণ বয়স্ক বীটল ২. পাতাতে ডিম্বাকৃতি অবস্থায় ৩. পাতাতে পূর্ণবয়স্ক বীটল

চিত্র ৮.৪.২: পামরী পোকা।

নিয়ন্ত্রণঃ

- মশারির জাল দ্বারা এগুলো সংগ্রহ করে কেরোসিনে ডুবিয়ে মারা।
- চারা লাগানোর সময় চারার মাথা ছাঁটাই করে নিলে এ পোকার আক্রমণ কম হয়।
- কৃষিতত্ত্ব বিভাগের অনুমোদিত মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করা।

গান্ধী পোকা

গান্ধী পোকার জীবনের সকল স্তরই ধানের জন্য ধ্বংসাত্মক। এ পোকা ডিম থেকে বের হয়েই কচি ধান থেকে রস শোষণ করে বড় হয়। আক্রমণ বেশি হলে সারা মাঠের আবাদ শূন্যের কাঠায় উঠে আর চিটার গাদা বড় হয়। এ পোকা সকল মৌসুমের ধানের আক্রমণ করে থাকে।

নিয়ন্ত্রণঃ

- পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রাথমিক অবস্থায় পোকা দমন করতে পারলে খরচ কম ও শস্যের উৎপাদন বেশি হয়।
- আলোর ফাঁদ পেতে গর্ত করে কেরোসিন মিশ্রিত পানিতে পোকা ধ্বংস করা হয়।
- ধানের মাজরা পোকা শীষ নষ্ট করে।
- পামরী পোকা পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে।
- গান্ধী পোকা কচি ধান থেকে রস শোষণ করে।
- সময়মত প্রতিরোধ এবং দমনমূলক ব্যবস্থা শস্য সংরক্ষণে খুবই সহায়ক।

চিত্র ৮.৪.৩: ১. গান্ধী পোকা, ২. ধানের শীষে শোষণরত গান্ধীপোকা।

পাটের পোকাসমূহ

পাট বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল। বিভিন্ন জাতের পোকা এ ফসলের অভূত ক্ষতি সাধন করে থাকে। বেশি ক্ষতিকারক পোকগুলো হলো পাটের বিছা পোকা, পাটের ঘোড়া পোকা, পাটের চেলে পোকা।

বিছা পোকা

বিছা পোকা পাটের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে থাকে। বর্ষকালে ঝাকে ঝাজে পাট ক্ষেতে বিছা পোকার আক্রমণ আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন। এ বিছা পোকা পাটের পাতা খেয়ে গাছ পাতা শূন্য করে দেয়। ফলে পাটের ফলন কমে যায়।

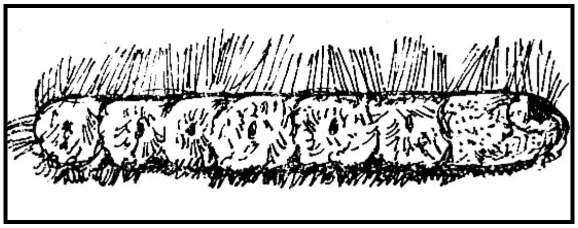

চিত্র ৮.৪.৪: বিছা পোকা।

দমন পদ্ধতি:

- আক্রমণের প্রথমাবস্থায় পাতার ডিমগুলো ধ্বংস করা।
- খুব আক্রান্ত ক্ষেতের চারদিকে পরিখা খনন করে পানি রাখার ব্যবস্থা করে তাতে কিছু কেরোসিন মিশিয়ে লম্বা রশি পাট গাছের উপর দিয়ে টেনে দিলে বিছাগুলো কেরোসিন মিশ্রিত পানিতে পরে মারা যায়। আবার পরবর্তী মাঠেও আক্রমণ হয় না।
- কৃষি কীটতত্ত্ব বিভাগের নির্ধারিত মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করেও এ পোকা দমন করা যায়।

ঘোড়া পোকা

পাটের ঘোড়া পোকা গ্রামের মানুষের খুব পরিচিত। বর্ষাকালে পাট ক্ষেতের আশে পাশে গেলেই এ পোকার উপস্থিতি বুঝা যায়। শরীরের অগ্রপশ্চাত এক সাথে করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। পাটের পাতায় এরা ডিম পারে এবং শত শত পোকা ডিম ফুটে বের হয়ে আসে এবং পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। এ পোকা গাছের উপরের দিকের কচি পাতা খেয়ে গাছের ক্ষতি সাধন করে।

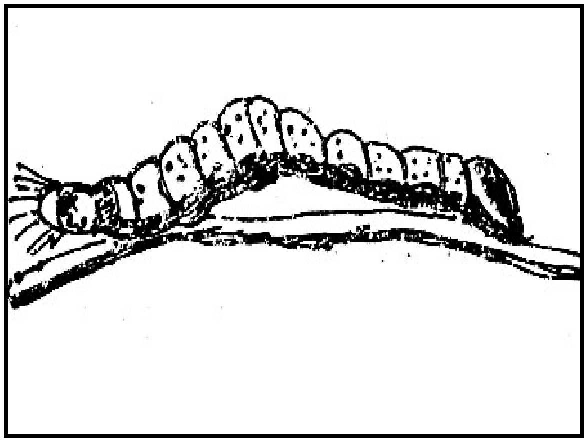

চিত্র ৮.৪.৫: ঘোড়া পোকা।

দমন পদ্ধতি:

- পাট ক্ষেতের মাঝে মাঝে গাছের লম্বা ডাল পুতে রাখলে পাখিরা এ সহজে খেয়ে ফেলে।
- কেরোসিন মিশ্রিত লম্বা দড়ি পাট জমির উপর দিয়ে টেনে নিলে পোকা নিচে পড়ে যায়।
- জমির আলোর জঙ্গল পরিষ্কার রাখলে কীড়া পুত্তলি আকারে লুকিয়ে থাকতে পারে না।
- শীতকালে জমির আইল পরিষ্কার করে পুড়িয়ে দিলে পুত্তলি ধ্বংস হয়ে যায়।

চেলে পোকা

পাটের চেলে পোকা জীবনের সকল অবস্থায় বিভিন্নভাবে পাটের ক্ষতি সাধন করে। বয়স্ক স্ত্রী পোকা চারার ডগার দিকে কচি পাতার গোড়ায় ছিদ্র করে ডিম পারে। ডিম থেকে কীড়া বেরিয়ে এসে কচি পাতা খেতে থাকে এবং এরপর পুত্তলি জীবন ধারণ করে। পাতার গোড়ার দিকে ছিদ্র করার দরুন চারা গাছের কাণ্ডে গিট তৈরি হয়। পাট পচানোর পর গিটে পাট ছিড়ে যায় এবং পাটের মানের অবনতি ঘটায়।

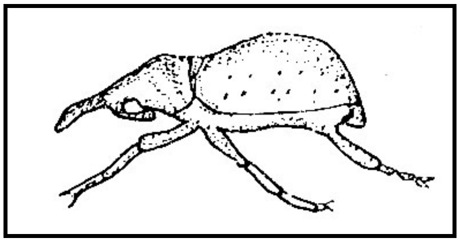

চিত্র ৮.৪.৬: চেলে পোকা।

দমন পদ্ধতি

- পাটের জমির যেখানে উদ্ভিদের এবং আবর্জনার স্তূপ থাকে সেখানে বয়স্ক পোকা লুকিয়ে থাকে। অতএব আগাছা বা পাটের চারার স্তূপ পাট জমি থেকে সরিয়ে নিতে হবে।
- বয়স্ক গাছে এদের অস্তিত্ব খোঁজে পাওয়া যাবে না তাই চারা গাছে এদের খোঁজে বের করে বিস্তারের প্রাথমিক অবস্থায় মেরে ফেললে খুব সহজে এ পোকা দমন করা যায়।
- কৃষি কীটতত্ত্ব বিভাগের নির্ধারিত ঔষধ প্রয়োগ করে এ পোকা দমন করা যায়।

উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণ

প্রতি বছর আমাদের দেশে কোটি কোটি টাকার শস্য উদ্ভিদ রোগ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। যথা সময়ে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে আমরা অনেক লাভবান হতে পারি। উদ্ভিদের রোগ লক্ষণ পরিলক্ষিত হলেই রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। উদ্ভিদের রোগ সাধারণত প্রতিরোধম লক ও দমনম লক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।

উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিম্নলিখিত উপায়ে করা যায়–

- প্রতিরোধী জাত চাষ করে।
- বিদেশ থেকে আনীত বীজ বাছাই করে।
- রোগ জীবাণু লুকিয়ে থাকতে পারে এরূপ আবর্জনা পরিষ্কার করে।
- সময়মত যথার্থভাবে ভূমিকর্ষণ উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।

উদ্ভিদের রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে নিরাময়ম লক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। নিরাময়ম লক ব্যবস্থার জন্য নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে:

- শস্যের জাত ও প্রকৃতি
- রোগের প্রকৃতি
- রোগ জীবাণুর প্রকৃতি।

শস্য, রোগ এবং রোগ জীবাণুর প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকলেই রোগ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। এ ব্যাপারে কৃষি রোগতত্ত্ব বিভাগের পরামর্শ গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য।

রোগ প্রতিরোধম লক ব্যবস্থার জন্য নিচের পন্থাগুলো অবলম্বন করা যায়–

- রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করা।
- মাঠের পরিচ্ছন্নতা।
- মাটির উর্বরতা সুষমকরণ।
- পর্যাপ্ত ভূমিকর্ষণ।
- শস্য পর্যায় অনুসরণ।
- সময়মত আগাছা দমন।
- রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ।
- বীজ শোধন।
- রোগাক্রান্ত উদ্ভিদ ধ্বংস।
- সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার।
- সময়মত পানি সরবরাহ।
- রোগ জীবাণু বাহক নিয়ন্ত্রণ।
- মাটি শোধন।
- বিদেশ থেকে আনীত বীজ পরীক্ষণের মাধ্যমে রোগ জীবাণু ধ্বংস করা।
- বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ফসল সংরক্ষণ।

ধানের মাজরা পোকা, পামরী পোকা, গান্ধী পোকা, পাটের বিছা পোকা, ঘোড়া পোকা ও চেলে পোকা ফসলের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। এগুলো প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। পোকার মত রোগও শস্যের অনেক ক্ষতি করে থাকে। প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থার মাধ্যমে উদ্ভিদের রোগ নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে এক (ক) বৃত্তায়িত করুন)।

১. রোগ বালাই আমাদের দেশে ফসলের শতকরা কত অংশ নষ্ট করে থাকে?
ক. ৫–৮ ভাগ
খ. ৮–১২ ভাগ
গ. ১২–১৫ ভাগ
ঘ. ১৫–১৮ ভাগ।

২. শস্য সংরক্ষণের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা কোনটি?
ক. সরকারের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ
খ. জন সাধারণকে সচেতন করে তোলা
গ. শস্য সংরক্ষণের জন্য অতিরিক্ত ফাণ্ড বরাদ্দকরণ
ঘ. সঠিক সময়ে শস্যের আবাদ করা।

৩. পামরী পোকা কিভাবে গাছের ক্ষতি সাধন করে?
ক. কচি পাতা খেয়ে
খ. পাতার সবুজাংশ খেয়ে
গ. শীষের গোড়া নষ্ট করে
ঘ. কাণ্ড খেয়ে।

৪. পাটের বিছা পোকা কিভবে গাছের ক্ষতি করে থাকে?
ক. পাটের কাণ্ড খেয়ে ফেলে
খ. শুধু কচি পাতাগুলো খেয়ে ফেলে
গ. পাটের সকল পাতা খেয়ে ফেলে
ঘ. শুধু বয়স্ক পাতাগুলো খেয়ে ফেলে।

৫. পাটের চেলে পোকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে কিভাবে?
ক. পাটের কচি পাতা খেয়ে
খ. পাটের পাতা খেয়ে
গ. পাট গাছের কাণ্ডে গিট সৃষ্টি করে
ঘ. পাটের শিকড় নষ্ট করে।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শস্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।
২. উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আলোচনা করুন।
৩. উদ্ভিদের কীট পতঙ্গ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। খ, ৩। খ, ৪। গ, ৫। গ।

পাঠ ৫ ব্যবহারিক: বীজের অঙ্কুরোদগম ও জৈবসার প্রস্তুতকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বীজের অঙ্কুরোদগম প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন;
- অঙ্কুরোদগম প্রক্রিয়া হাতেকলমে করে দেখাতে পারবেন;
- জৈবসার প্রস্তুত পদ্ধতির বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- হাতেকলমে জৈবসার তৈরি দেখাতে পারবেন।

প্রসঙ্গিক তথ্য

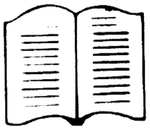

এই অনুশীলনীটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশ বীজের অঙ্কুরোদগম এবং দ্বিতীয় অংশ জৈবসার প্রস্তুতকরণ। তত্ত্বীয় পাঠে আপনারা জেনেছেন বীজ কি, বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় নিয়ামকগুলো কি। জৈবসার কি, জৈবসারের প্রকারভেদ এবং প্রস্তুত প্রণালী তত্ত্বীয় অংশে আলোচিত হয়েছে।

উপকরণ

- বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত পরিমাণের বীজ, পেট্রিডিস, ব্লটিং পেপার, নোট বই ইত্যাদি প্রয়োজন।
- জৈবসার প্রস্তুতির জন্য আবর্জনা, গোচোনা, টিএসপি, পানি, বাঁশের খুটি, দড়ি, কর্ক ইত্যাদি প্রয়োজন।

কাজের ধাপ

- **বীজের অঙ্কুরোদগম**
  - ১০ গ্রাম পাজাম ধানের বীজ নিন।
  - বীজ থেকে অন্য ধানের বীজ আবর্জনা পরিষ্কার করুন।
  - এবার বীজের ওজন নিন।
  - সূত্র মোতাবেক বিশুদ্ধ বীজের হার নির্ণয় করুন। $\frac{\text{বিশুদ্ধ বীজ}}{\text{গৃহীত বীজ}} \times ১০০$
  - পাঁচটি পেট্রিডিস নিয়ে মাপমত কাটা ব্লটিং পেপার পেট্রিডিসে বিছিয়ে নিন।
  - পানিতে ভালভাবে ভেজানো বীজ এখন সমানভাবে ভাগ করে পেট্রিডিসে রাখুন।
  - পেট্রিডিসগুলো আলো বাতাসযুক্ত গরম জায়গায় রাখুন।
  - বীজ শুকিয়ে গেলে মধ্যে মধ্যে পানি ছিটিয়ে দিন।
  - দুদিন পর বীজের সংখ্যা এবং অঙ্কুরিত বীজের সংখ্যা গুণে নিন।
  - এবার সূত্র মোতাবেক বীজের বিশুদ্ধতার হার নির্ণয় করুন। $\frac{\text{অঙ্কুরিত বীজের সংখ্যা}}{\text{মোট বীজের সংখ্যা}} \times ১০০$

অন্য বীজ নিয়েও এ পরীক্ষণটির অনুশীলন করুন।

সতর্কতা

পরীক্ষণের প্রতিটি ধাপই সতর্কতার সাথে করতে হবে। পেট্রিডিসে বীজ রাখার পর খেয়াল রাখতে হবে যেন ইঁদুর বা অন্য প্রাণী বীজের ক্ষতি সাধন না করে।

জৈব সার প্রস্তুতকরণ

- বৃষ্টির পানি জমে থাকে না আবার বর্ষার পানি উঠে না। অথচ প্রয়োজনে কিছু পানি পাওয়া যায় গাছের ছায়ায় এরূপ একটি জায়গা নির্বাচন করুন।
- কোদাল, কাস্তে, ফর্ক, বাঁশের খুটি ও দড়ি যোগাড় করুন।
- কচুরি পানা অথবা আগাছা যোগাড় করুন।
- গোচোনা এবং কিছু টিএসপি সার যোগাড় করুন।
- কচুরিপানা বা আবর্জনার পরিমাণের উপর নির্ভর স্তূপের আকার নির্ধারণ করুন।
- চারকোণে বাঁশের খুটি পুতে রশি দিয়ে টানা দিন।
- স্তরে স্তরে সীমানার ভিতরে কচুরিপানা বা আবর্জনা ছড়িয়ে দিন। তার উপর গোচোনা, টিএসপি হাল্কা করে ছিটিয়ে দিন। এভাবে চার স্তর সম্পন্ন করুন।
- এক মাস পর পর স্তরগুলো উল্টিয়ে দেন। যদি শুকনা মনে হয় কিছু গোচোনা অথবা পানি ছিটিয়ে দিন।
- ৩-৪ মাসে জৈবসার প্রস্তুত হয়ে যায়।
- স্তূপের ভিতর একটি শক্ত কাঠি ঢুকিয়ে দিন। তা এক টানে বের করে দেখুন কাঠিতে যদি মাটির বা বাদামী রংয়ের পদার্থ লেগে থাকে তবে বুঝতে হবে সার ব্যবহারের উপযোগী হয়েছে।

অনুশীলন

বিভিন্ন প্রকার আবর্জনা দিয়ে আবর্জনা স্তূপ তৈরি করুন।

সতর্কতা

স্তর সময়মত উল্টিয়ে না দিলে জৈব সার ঠিকমত প্রস্তুত হবে না। প্রয়োজনবোধে অবশ্যই আবর্জনার স্তূপে পানি দিতে হবে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে এক (ক) বৃত্তায়িত করুন)।

১. বীজ কিভাবে বংশগত বিশুদ্ধতা হারায়?
ক. বীজের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কৃষকের জ্ঞানের অভাবে
খ. বীজ সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত না হলে
গ. পর পরাগায়নের মাধ্যমে
ঘ. এলোমেলো প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ করলে।

২. বীজের বিশুদ্ধতা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা কি?
ক. কাঙ্খিত ফলন প্রাপ্তি
খ. পোকা প্রতিরোধ
গ. রোগ প্রতিরোধ
ঘ. উন্নতমানের বীজ প্রাপ্তি।

৩. মালা ধানের একটি নমুনার ওজন ১০ গ্রাম। এ নমুনা থেকে অবাঞ্ছিত বীজ ও অন্যান্য আবর্জনা পরিষ্কার করার পর নমুনার ওজন দাড়াল ৮ গ্রামে। এ বীজ নমুনার বিশুদ্ধতার হার কত?
ক. ৬৪
খ. ৭২
গ. ৮০
ঘ. ৮।

৪. মাটির উপরিভাগের আস্তরের কৌশিক নালী কিভাবে শস্যের ক্ষতি করে থাকে?
ক. কৌশিক নালী কেঁচো ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য উপাদান জমি থেকে বের করে দেয়
খ. কৌশিক নালী উপকারী ব্যাকটেরিয়ার বংশ বৃদ্ধিতে বাধা দেয়
গ. কৌশিক নালীর মাধ্যমে গাছের তামা জাতীয় দ্রবীভূত খাদ্য উপাদান বায়ুমণ্ডলে চলে যায়
ঘ. কৌশিক নালীর সাহায্যে মাটির আভ্যন্তরীণ পানি বায়ুমণ্ডলে চলে যায়।

৫. আন্তকর্ষণ কি?
ক. দু ফসলের মধ্যবর্তী সময়ে জমি কর্ষণ করা
খ. জমিতে ফসল থাকা অবস্থায় কর্ষণ করা
গ. কর্ষণের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করা
ঘ. কর্ষণের মাধ্যমে জমির উর্বরতা রক্ষা করা।

৬. নিচের কোনটি শূন্য কর্ষণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত?
ক. আদা হলুদ একসাথে করা
খ. ধান ক্ষেতে খেসারী ডাল চাষ করা
গ. ইরি ধান চাষের পর মুগ ডাল চাষ করা
ঘ. সরিষা আবাদের পর কলার বাগান করা।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভাল বীজের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।
২. বীজে বিশুদ্ধতা নির্ণয় পদ্ধতি আলোচনা করুন।
৩. রোপা ধানের বীজতলা তৈরি পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
৪. অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা কি? কৈশিক নালী কিভাবে শস্যের ক্ষতি করে?
৫. মই ও আচড়ার কাজগুলো উল্লেখ করুন।
৬. পরিমিত নাইট্রোজেন ব্যবহারে গাছের কি উপকার হয়?
৭. সবুজসার প্রস্তুতির উপযোগী উদ্ভিদগুলোর নাম উল্লেখ করুন।
৮. ধানের মাজরা পোকা আক্রমণের লক্ষণগুলো কি? কিভাবে এ পোকা দমন করা যায়?

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। ক, ৩। গ, ৪। ঘ, ৫। খ, ৬। খ।